সুকান্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

সুকান্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা

সম্পাদনা

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৮

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪০১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

চতুর্থ সংস্করণ ত্রয়োদশ মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
আশি টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0017-9

ভূমিকা

বিশ শতকের বাঙালি কবিদের মধ্যে যাঁরা পাঠকের মনে সবচেয়ে গভীর বেদনা ও বিস্ময় জাগিয়েছেন, সুকান্ত তাঁদের অন্যতম। বেদনা তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্যে; বিস্ময়, কবি হিসেবে তাঁর অকাল পরিণতির জন্যে। মাত্র তের-চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর লেখা 'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো সহজ কবিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিতে বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো কবিদেরও সেকালে চমকে দিয়েছিল। তাঁদের চোখের সেই অপ্রত্যাশিত বিস্ময়, পঞ্চাশ বছর পরে, আজকের সবচেয়ে তরুণ কাব্যপাঠকের চাউনিতেও একইরকম স্পষ্ট।

একজন পরিপূর্ণ কবির শক্তি জেগে উঠেছিল তাঁর মধ্যে প্রায় কিশোরবয়স থেকেই। প্রায় কবিতা না-লিখেই কবিজীবনের প্রস্তুতিপর্ব তিনি শেষ করেছিলেন। কলমে তিনি যা লিখেছিলেন, তাঁর হৃদয় তার বহুগুণ বেশি লিখে ফেলেছিল। না হলে এই অভাবিত বিকাশ সম্ভব ছিল না। কবিতা তাঁর মধ্যে জীবনের মতোই সহজে ফলে উঠেছিল, আলাদা করে গড়ে তুলতে হয়নি। যে বয়সে মৃত্যু হলে বাংলাভাষার অধিকাংশ প্রধান কবি এই কাব্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ও বিস্মৃত হতেন, সেই বয়সে প্রয়াত হয়েও তিনি এই কবিতার অন্যতম স্মরণীয় ও আলোচিত ব্যক্তিত্ব।

কবিতার বিষয় হিসেবে একটি নতুন ও শক্তিমান বক্তব্যকে পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর যুগের কাছ থেকে—ব্যথিত ও বঞ্চিত মানুষদের মুক্তি ও সুখের স্বপ্ন। শোষকের হাতে নির্যাতিত ঐ দুঃখী মানুষের বেদনাকে তিনি তাঁর রক্তে মজ্জায় অশ্রুতে এমন আর্তের মতো অনুভব করেছিলেন যে তাঁর কবিতা তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের দাসত্ব এড়িয়ে একটা কবিতার মানবিক ও অনুভূতিময় জগতে মুক্তি পেয়েছিল। এইখানেই তিনি ছিলেন কবি—কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পার্থক্যরহিত—শোক এবং উদ্দীপনার এক সজীব জগতের রচয়িতা—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ তাঁর সহযাত্রী কবিদের চাইতে ওপরে। সুকান্তের কবিতা সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব থেকে উঠে আসেনি, উঠে এসেছিল 'সমাজতান্ত্রিক জীবনবোধ' থেকে, তাই সব সৎ কবিতার মতো এই কবিতা এতখানি জীবনমুখী এবং অধিকাংশ অকবির মতো কোনো তত্ত্ব বা কাব্যত্বকে যেহেতু তিনি জীবনের চেয়ে বড় মনে করেননি, তাই জীবন, প্রতিদানে, নিজস্ব অন্তঃশক্তির প্রাচুর্যে তাঁর কবিতাকে শক্তিমান করে তুলেছিল।

তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল এমন ফলন্ত ও সহজবিহারী যে তা যে-কোনো বিষয়কে তাঁর কবিতার যোগ্য করে তুলতে পারত—বিষয়টা সকলের জন্যে হয়ে উঠত সজীব বিশ্বাসের বস্তু। যে-কোনো তুচ্ছ এমনকি প্রায় অসম্ভব চিন্তাও তাঁর হাতে দেখতে দেখতে অনবদ্য কবিতা হয়ে উঠত। ছন্দের প্রতিভা ছিল তাঁর জন্মগত, শব্দেরা ছিল বলিষ্ঠ, আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল। পরিণত রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষার শক্তি ও সৌন্দর্যকে অতি সহজেই আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন সুকান্ত। প্রায় একই বিষয় নিয়ে লিখে তাঁর সহযাত্রী অনেকেই যখন আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন, তখন এই সহজ শক্তির কারণেই তিনি আজ পর্যন্ত আমাদের কবিতাজগতে প্রথমদিনের মতোই রক্তিম।

সুকান্ত আমাদের সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিদের অন্যতম। তাঁর কবিতার বক্তব্যের সাথে যাঁরা একমত তাঁরাও যেমন তাঁর কবিতার একান্ত ভক্ত, তেমনি যাঁরা তাঁর কাব্যবক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধী তাঁরাও তাঁর কবিতাকে ভালো না-বেসে পারেন না। তাঁর এই জনপ্রিয়তা তাঁর কবিতার শক্তিকেও কমবেশি প্রমাণ করে বলেই আমার ধারণা। তবু মনে রাখতে হবে কবিতার বিষয়বস্তু একজন কবিকে কখনো কখনো জনপ্রিয়তা দিলেও সুদীর্ঘ কালের আয়ু দিতে পারে না। অধিকাংশ সময় জনপ্রিয় কবিরাই বরং হন, সবচেয়ে 'বিস্মরণপ্রিয়' কবি। অথচ সুকান্ত কবিতার জগতে এই আয়ু পেয়েছেন। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর অনন্য কবিত্বশক্তিরই কারণে। কিন্তু সুকান্তের উজ্জ্বল কবিপ্রতিভা এখনও অব্যাখ্যাত। সাধারণ পাঠক সহজাত বোধ দিয়ে তাঁর প্রতিভাকে রক্তের গভীরে অনুভব করেছে, সমালোচকেরা ফিরে-ফিরে তাঁর কবিত্ব-শক্তির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেই প্রতিভার আসল দীপ্তিটি ঠিক কোথায় বা কতটুকু,—কেউ তা পাপড়ির মতোন মেলে মেলে, খুলে খুলে বা চারপাশ থেকে তার ওপর উজ্জ্বল আলো ফেলে আজও তুলে ধরেনি।

আমার ধারণা সুকান্তের কাব্যপ্রতিভার মূল্যায়নের দিকটি এভাবে অবজ্ঞাত হয়ে যাবার কারণ তাঁর কবিতার রাজনৈতিক মতবাদ। সুকান্ত তাঁর বক্তব্যকে সততায় গভীরতায় আবেগাশ্রিত করে মতবাদের শিলীভূত জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে কবিতার উপজীব্য করেছিলেন বটে, কিন্তু শেষ বিচারে তাঁর কবিতা রাজনৈতিক মতবাদেরই কবিতা। তাঁর রাজনৈতিক সহযাত্রীরা তাঁর এই কবিত্বশক্তির ব্যাপারটাকে খুব-একটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। বরং তাঁর কবিতাগুলোর বিপুল জনপ্রিয়তাকে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক স্বপ্নসিদ্ধির উপায় হিসেবে (প্রায় স্বর্গ থেকে) পেয়ে গিয়ে খানিকটা পরিতৃপ্তই ছিলেন। তাছাড়া তাদের সবাই প্রধানত ছিলেন রাজনৈতিক চিন্তাচেতনায় ভাবিত, ফলে কাব্য-বিচারের দিকটি স্বভাবতই ছিল তাঁদের আয়ত্তের বাইরে। তাঁদের দলে যাঁরা কাব্যভাবনায় ভাবিত ছিলেন, তাঁদের যোগ্যতাও খুব একটা উঁচু পর্যায়ের ছিল না। পক্ষান্তরে যাঁরা রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে ছিলেন তাঁর বিরোধী শিবিরের মানুষ (এবং কাব্যরসবেত্তা হিসেবে উন্নততর) তাঁরা সুকান্তের কবিত্বশক্তির প্রতি পূর্বাপর শ্রদ্ধা জানালেও কবি হিসেবে (তাঁদের কথিত) তাঁর খণ্ডিত সাফল্যের দায়ভার শেষপর্যন্ত তাঁর কবিতার মতবাদের ওপরেই ফিরে-ফিরে চাপাতে চেয়েছেন এবং এই বলে আক্ষেপে ভারাক্রান্ত হয়েছেন যে, বাংলা কবিতার বৈভবময় যুগের এই সর্বশেষ কবিপ্রতিভার ঈর্ষিত কবিত্বশক্তি কীভাবে একটা অযোগ্য বিষয়ের ওপর ব্যয়িত হয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। 'কবি' সুকান্তের মূল্যায়ন প্রতিভাবান রসবেত্তাদের হাতে না-হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের এই প্রিয় অকালপ্রয়াত কবিকে হয়তো ভালোবেসে যাব, কিন্তু কবি হিসেবে তাঁর দীপ্তি সম্বন্ধে থেকে যাব একই রকম অগোচর।

এই সংকলনে সুকান্তের সবচেয়ে প্রিয় ও আদৃত কবিতাগুলোকে গ্রথিত করা হল। কবিতা চয়নের সময় কবিতাগুলোর মধ্যে সেইসব আলোকোজ্জ্বলতাকেই ফিরে-ফিরে অন্বেষণ করেছি যা তাঁর কবিপ্রতিভার সুন্দরতম পরিচয়—কবি হিসেবে তাঁর শক্তিকে খুঁজে পেতে হলে যেগুলো ব্যবহৃত হতে পারবে ঐ অন্বেষার ভিত্তি হিসেবে।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
২৩ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা ১২১৭

সূচি

ছাড়পত্র

ছাড়পত্র/ ৯ রানার ৯ আঠারো বছর বয়স/১১
একটি মোরগের কাহিনী/ ১২ কলম/১৩ রবীন্দ্রনাথের প্রতি/১৪
আগামী/১৫/ অনুভব/১৬ সিগারেট/১৭ প্রার্থী/১৮ চারাগাছ/১৯
খবর/২০ ঠিকানা/২১ লেনিন/২৩ দেশলাই কাঠি/২৪
বিবৃতি/২৫ চিল/২৬ বোধন/২৭ ইউরোপের উদ্দেশে/২৯
প্রস্তুত/৩০ শত্রু এক/৩১ মজুরদের ঝড়/৩১ ডাক/৩৩
কৃষকের গান/৩৩ ফসলের ডাক : ১৩৫১/ ৩৪ এই নবান্নে/৩৫
হে মহাজীবন/৩৬

ঘুম নেই

বিক্ষোভ/ ৩৬ ১লা মে-র কবিতা : ৪৬/৩৭ বিদ্রোহের গান/৩৭
অনন্যোপায়/ ৩৯ কবিতার খসড়া/৩৯ সূচনা/৩৯ মণিপুর/৪০
চিরদিনের/ ৪২ কবে/৪৩ মহাত্মাজির প্রতি ৪৪
পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে/৪৪ মীমাংসা/৪৬ জনরব/৪৬
রৌদ্রের গান/৪৭ দেওয়ালি/৪৮

পূর্বাভাস

হে পৃথিবী/৪৯ সুতরাং/৫০ স্বপ্নপথ/৫০ বুদ্বুদ মাত্র/৫০
আমার মৃত্যুর পর/৫১ তরঙ্গভঙ্গ/৫১ উদ্যোগ/৫২
জাগবার দিন আজ/৫৩ ঘুমভাঙার গান/৫৩ দেয়ালিকা/৫৪
মৃত পৃথিবী/৫৫ দুর্মর/৫৬

মিঠে কড়া

অতি কিশোরের ছড়া/৫৭ ভালো খাবার/৫৭ ব্ল্যাক-মার্কেট/৫৮
সিপাহি বিদ্রোহ/৫৯ পুরনো ধাঁধা/৬০ মেয়েদের পদবি/৬০
খাদ্য সমস্যার সমাধান/৬১ বিয়েবাড়ির মজা/৬১ জ্ঞানী/৬২
গোপন খবর/৬৩ ভেজাল/৬৩ এক যে ছিল/৬৪

ছাড়পত্র

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম :
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে।
খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে-ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার।
আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে-ভাষা
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের—
পরিচয়-পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর
অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।
এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ-বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,

তারপর হব ইতিহাস॥

রানার

রানার ছুটেছে তাই ঝুম্‌ঝুম্‌ ঘণ্টা বাজছে রাতে
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে,
রানার চলেছে, রানার!
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।

রানার! রানার!
জানা-অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে;
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ—বুঝি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ।
অবাক রাতের তারারা আকাশে মিট্‌মিট্‌ করে চায়;
কেমন ক'রে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায়!
কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে;
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্‌, জোনাকিরা দেয় আলো
মাভৈঃ রানার! এখনো রাতের কালো।

এমনি ক'রেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে,
পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌঁছে দিয়েছে 'মেলে'।
ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।
অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

রানার! রানার!
এ-বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?
ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া,
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে
কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।
দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি—
এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি—
রানার! রানার! কী হবে এ বোঝা ব'য়ে?

কী হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে?
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে—আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?

রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;
শপথের চিঠি নিয়ে চল আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর
অগ্নগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি—
নেই, দেরি নেই আর,
ছুটে চল, ছুটে চল, আরো বেগে
দুর্দম, হে রানার॥

আঠারো বছর বয়স

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর-বাধা,
এ-বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়—
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ-বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ-বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ-বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,

দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার
ক্ষত বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো
এ-বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ-বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।

তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ-বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ-বয়স অগ্রণী
এ-বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

এ-বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ-বয়স যায় না থেমে,
এ-বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—
এ-দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে॥

একটি মোরগের কাহিনী

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে,
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু-তিনটি মুরগির সঙ্গে।
আশ্রয় যদিও মিলল,
উপযুক্ত আহার মিলল না।
সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটাল সেই মোরগ
ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত—
তবুও সহানুভূতি জানাল না সেই বিরাট শক্ত ইমারত।

তারপর শুরু হল তার আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা,
আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগল
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার।
তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এল অংশীদার
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু-তিনটে মানুষ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেল বন্ধ হয়ে।

খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার!
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করল প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারই তাড়া খেল প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে—
'প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার!'

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপ্‌ধপে সাদা দামি কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে;
অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসেবে ॥

কলম

কলম, তুমি কত-না যুগ কত-না কাল ধরে
অক্ষরে অক্ষরে
গিয়েছ শুধু ক্লান্তিহীন কাহিনী শুরু করে।
কলম, তুমি কাহিনী লেখ, তোমার কাহিনী কি
দুঃখে জ্বলে তলোয়ারের মতন ঝিকিমিকি?

কলম, তুমি শুধু বারংবার
আনত করে ক্লান্ত ঘাড়
গিয়েছ লিখে স্বপ্ন আর পুরনো কত কথা,
সাহিত্যের দাসত্বের ক্ষুধিত বশ্যতা।
ভগ্ন নিব, রুগ্‌ণ দেহ জলের মতো কালি
কলম, তুমি নিরপরাধ তবুও গালাগালি
খেয়েছ আর সয়েছ কত লেখকদের ঘৃণা,
কলম, তুমি চেষ্টা করো, দাঁড়াতে পারো কি না।

হে কলম! তুমি কত ইতিহাস গিয়েছ লিখে,
লিখে লিখে শুধু ছড়িয়ে দিয়েছ চতুর্দিকে।
তবু ইতিহাস মূল্য দেবে না, এতটুকু কোণ
দেবে না তোমায়, জেনো ইতিহাস বড়ই কৃপণ;
কত লাঞ্ছনা, খাটুনি গিয়েছে লেখকের হাতে
ঘুমহীন চোখে অবিশ্রান্ত অজস্র রাতে।
তোমার গোপন অশ্রু তাইতো ফসল ফলায়
বহু সাহিত্য বহু কাব্যের বুকের তলায়।

তবু দেখ বোধ নেই লেখকের কৃতজ্ঞতা,
কেন চলবে এ প্রভুর খেয়ালে, লিখবে কথা?

হে কলম! হে লেখনী! আর কত দিন
ঘর্ষণে ঘর্ষণে হবে ক্ষীণ?
আর কত মৌন-মূক, শব্দহীন দ্বিধান্বিত বুকে
কালির কলঙ্ক চিহ্ন রেখে দেবে মুখে?
আর, কত আর
কাটবে দুঃসহ দিন দুর্বার লজ্জার?
এ দাসত্ব ঘুচে যাক, এ কলঙ্ক মুছে যাক আজ
কাজ করো—কাজ।

মজুর দেখ নি তুমি? হে কলম, দেখ নি বেকার?
বিদ্রোহ দেখ নি তুমি? রক্তে কিছু পাও নি শেখার?
কত-না শতাব্দী, যুগ থেকে তুমি আজো আছ দাস,
প্রত্যেক লেখায় শুনি কেবল তোমার দীর্ঘশ্বাস!
দিন নেই, রাত্রি নেই, শ্রান্তিহীন, নেই কোনো ছুটি
একটু অবাধ্য হলে তখুনি ভ্রুকুটি;
এমনি করেই কাটে দুর্ভাগা তোমার বারো মাস,
কয়েকটি পয়সায় কেনা, হে কলম, তুমি ক্রীতদাস।
তাই যত লেখ, তত পরিশ্রম এসে হয় জড়ো,
—কলম! বিদ্রোহ আজ! দল বেঁধে ধর্মঘট কর।
লেখক স্তম্ভিত হোক, কেরানিরা ছেড়ে দিক হাঁফ,
মহাজনি বন্ধ হোক, বন্ধ হোক মজুতের পাপ;
উদ্বেগ-আকুল হোক প্রিয়া যত দূর-দূর দেশে,
কলম! বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট হোক অবশেষে;
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম,
আনো দিকে দিকে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রুকুটি;
এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে,
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।
এখনো স্বগত ভাবাবেগে,

মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে।
তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে,
গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারি মৃত্যুর কবলে;
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।

তবুও নিশ্চিত উপবাস
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস—
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।'
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে॥

আগামী

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ;
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে,
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তালে রেখে নেড়ে যাবে মাথা;
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে,
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।

সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড় :
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়;
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।

আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে;
জয়ধ্বনি কিশলয়ে : সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।
ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সেদিন ছায়ায় এসো : হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে;
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন ॥

অনুভব

১৯৪০

অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি!
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।
অবাক পৃথিবী! আমরা যে পরাধীন।
অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন;
অবাক পৃথিবী! অবাক করলে আরো—
দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো।
অবাক পৃথিবী! অবাক যে বারবার
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার।
হিসেবের খাতা যখনি নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত—'রক্ত খরচ' তাতে;
এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম।

১৯৪৬

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখে নি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ;
স্বপ্ন-চূড়ার থেকে নেমে এসো সব—
শুনেছ? শুনছ উদ্দাম কলরব?
নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত;
তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।
তাই তো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারিদিকে ॥

সিগারেট

আমরা সিগারেট।
তোমরা আমাদের বাঁচতে দাও না কেন?
আমাদের কেন নিঃশেষ করো পুড়িয়ে?
কেন এত স্বল্প-স্থায়ী আমাদের আয়ু?
মানবতার কোন্ দোহাই তোমরা পাড়বে?

আমাদের দাম বড় কম এই পৃথিবীতে।
তাই কি তোমরা আমাদের শোষণ করো?
বিলাসের সামগ্রী হিসাবে ফেলো পুড়িয়ে?
তোমাদের শোষণের টানে আমরা ছাই হই;
তোমরা নিবিড় হও আরামের উত্তাপে।

তোমাদের আরাম : আমাদের মৃত্যু।
এমনি ক'রে চলবে আর কত কাল?
আর কতকাল আমরা এমন নিঃশব্দে ডাকব
আয়ু-হরণকারী তিল তিল অপঘাতকে?
দিন আর রাত্রি—রাত্রি আর দিন!
তোমরা আমাদের শোষণ করছ সর্বক্ষণ—
আমাদের বিশ্রাম নেই, মজুরি নেই—
নেই কোনো অল্প-মাত্রার ছুটি।

তাই, আর নয়;
আর আমরা বন্দি থাকব না
কৌটোয় আর প্যাকেটে,
আঙুলে আর পকেটে,
সোনা-বাঁধানো 'কেসে' আমাদের নিশ্বাস হবে না রুদ্ধ
আমরা বেরিয়ে পড়ব,
সবাই একজোটে, একত্রে
তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে
জ্বলন্ত আমরা ছিট্‌কে পড়ব তোমাদের হাত থেকে
বিছানায় অথবা কাপড়ে;
নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে
বাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের,
যেমন ক'রে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছ এতকাল ॥

প্রার্থী

হে সূর্য! শীতের সূর্য!
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি,
যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে কৃষকের চঞ্চল চোখ,
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।

হে সূর্য, তুমি তো জান,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,
এক-টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!

সকালের এক-টুকরো রোদ্দুর—
এক-টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামি।

ঘর ছেড়ে আমরা এদিক-ওদিকে যাই—
এক-টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।

হে সূর্য!
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

হে সূর্য!
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক-একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
পরিণত হব!
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারব
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী॥

চারাগাছ

ভাঙা কুঁড়েঘরে থাকি :
পাশে এক বিরাট প্রাসাদ
প্রতিদিন চোখে পড়ে;
সে-প্রাসাদ কী দুঃসহ স্পর্ধায় প্রত্যহ
আকাশকে বন্ধুত্ব জানায়;
আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।
চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি—
এ-অট্টালিকার প্রতি ইঁটের হৃদয়ে
অনেক কাহিনী আছে। অত্যন্ত গোপনে,
ঘামের, রক্তের আর চোখের জলের।
তবু এই প্রাসাদকে প্রতিদিন হাজারে হাজারে
সেলাম জানায় লোকে, চেয়ে থাকে বিমূঢ় বিস্ময়ে।
আমি তাই এ-প্রাসাদে এতকাল ঐশ্বর্য দেখেছি,
দেখেছি উদ্ধত এক বনিয়াদি কীর্তির মহিমা।

হঠাৎ সেদিন
চকিত বিস্ময়ে দেখি
অত্যন্ত প্রাচীন সেই প্রাসাদের কার্নিশের ধারে
অশ্বত্থ গাছের চারা!

অমনি পৃথিবী
আমার চোখের আর মনের পর্দায়
আসন্ন দিনের ছবি মেলে দিল একটি পলকে।

ছোট ছোট ছারাগাছ—
রসহীন খাদ্যহীন কার্নিশের ধারে
বলিষ্ঠ শিশুর মতো বেড়ে ওঠে দুরন্ত উচ্ছ্বাসে।
হঠাৎ চকিতে,
এ-শিশুর মধ্যে আমি দেখি এক বৃদ্ধ মহীরুহ।
শিকড়ে শিকড়ে আনে অবাধ্য ফাটল
উদ্ধত প্রাচীন সেই বনিয়াদি প্রাসাদের দেহে।

ছোট ছোট চারাগাছ—
নিঃশব্দে হাওয়ায় দোলে, কান পেতে শোনে :
প্রত্যেক ইঁটের নিচে ঢাকা বহু গোপন কাহিনী
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের।

তাই তো অবাক আমি দেখি যত অশ্বত্থচারায়
গোপনে বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ;
প্রাসাদ-বিদীর্ণ-করা বন্যা আসে শিকড়ে শিকড়ে।

মনে হয়, এই সব অশ্বত্থ-শিশুর
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের
ধারায় ধারায় জন্ম,
ওরা তাই বিদ্রোহের দূত॥

খবর

খবর আসে!
দিগ্‌দিগন্ত থেকে বিদ্যুদ্‌বাহিনী খবর;
যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়—
—এখানে সাংবাদিকতার নৈশ নৈঃশব্দ্য।

রাত গভীর হয় যন্ত্রের ঝঙ্কৃত ছন্দে—প্রকাশের ব্যগ্রতায়;
তোমাদের জীবনে যখন নিদ্রাভিভূত মধ্যরাত্রি
চোখে স্বপ্ন আর ঘরে অন্ধকার।
অতল অদৃশ্য কথার সমুদ্র থেকে নিঃশব্দ শব্দেরা উঠে আসে;
অভ্যস্ত হাতে খবর সাজাই—
ভাষা থেকে ভাষান্তর করতে কখনো চমকে উঠি,
দেখি যুগ থেকে যুগান্তর।
কখনো হাত কেঁপে ওঠে খবর দিতে;
বাইশে শ্রাবণ, বাইশে জুনে।

তোমাদের ঘুমের অন্ধকার পথ বেয়ে
খবর-পরিরা এখানে আসে তোমাদের আগে,
তাদের পেয়ে কখনো কণ্ঠে নামে ব্যথা, কখনো-বা আসে গান;
সকালে দিনের আলোয় যখন তোমাদের কাছে তারা পৌঁছোয়
তখন আমাদের চোখে তাদের ডানা ঝরে গেছে।
তোমরা খবর পাও,
শুধু খবর রাখ না কারো বিনিদ্র চোখ আর উৎকর্ণ কানের।
ঐ কম্পোজিটর কি কখনো চমকে ওঠে নিখুঁত যান্ত্রিকতার কোনো ফাঁকে?
পুরনো ভাঙা চশমায় ঝাপসা মনে হয় পৃথিবী—
৯ই আগস্টে কি আসাম সীমান্ত আক্রমণে?
জ্বলে ওঠে কি স্তালিনগ্রাদের প্রতিরোধে, মহাত্মাজির মুক্তিতে,
প্যারিসের অভ্যুত্থানে?

দুঃসংবাদকে মনে হয় না কি
কালো অক্ষরের পরিচ্ছদে শোকযাত্রা?
যে-খবর প্রাণের পক্ষপাতিত্বে অভিষিক্ত
আত্মপ্রকাশ করে না কি বড় হরফের সম্মানে?
এ-প্রশ্ন অব্যক্ত অনুচ্চারিত থাকে
ভোরবেলাকার কাগজের পরিচ্ছন্ন ভাঁজে ভাঁজে।

শুধু আমরা দৈনন্দিন ইতিহাস লিখি!
তবু ইতিহাস মনে রাখবে না আমাদের—
কে আর মনে রাখে নবান্নের দিনে কাটা ধানের গুচ্ছকে?
কিন্তু মনে রেখো তোমাদের আগেই আমরা খবর পাই
মধ্যরাত্রির অন্ধকারে
তোমাদের তন্দ্রার অগোচরেও।
তাই তোমাদের আগেই খবর-পরিরা এসেছে আমাদের
চেতনার পথ বেয়ে
আমার হৃদযন্ত্রে ঘা লেগে বেজে উঠেছে কয়েকটি কথা—
পৃথিবী মুক্ত—জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী।
তোমাদের ঘরে আজো অন্ধকার, চোখে আজো স্বপ্ন।
কিন্তু জানি একদিন সে-সকাল আসবেই
যেদিন এই খবর পাবে প্রত্যেকের চোখেমুখে
সকালের আলোয়, ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়।

আজ তোমরা এখনো ঘুমে॥

ঠিকানা

ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু—
ঠিকানার সন্ধান,
আজও পাও নি? দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান?
ঠিকানা না-হয় না নিলে বন্ধু,
পথে পথে বাস করি,
কখনো গাছের তলাতে
কখনো পর্ণকুটির গড়ি।
আমি যাযাবর, কুড়াই পথের নুড়ি,
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে
আমি প্রতিদিন ঘুরি,
বন্ধু, ঘরের খুঁজে পাই নাকো পথ,
তাই তো পথের নুড়িতে গড়ব
মজবুত ইমারত।

বন্ধু, আজকে আঘাত দিয়ো না
তোমাদের দেওয়া ক্ষতে
আমার ঠিকানা খোঁজ ক'রো শুধু
সূর্যোদয়ের পথে।
ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া
রুশ ও চীনের কাছে,
আমার ঠিকানা বহুকাল ধ'রে
জেনো গচ্ছিত আছে।
আমাকে কি তুমি খুঁজেছ কখনো
সমস্ত দেশ জুড়ে?
তবুও পাও নি? তাহলে ফিরেছ
ভুল পথে ঘুরে ঘুরে।

আমার হদিশ জীবনের পথে
মন্বন্তর থেকে,
ঘুরে গিয়েছে যে কিছুদূর গিয়ে
মুক্তির পথে বেঁকে।
বন্ধু, কুয়াশা, সাবধান এই
সূর্যোদয়ের ভোরে;
পথ হারিয়ো না আলোর আশায়
তুমি একা ভুল ক'রে।
বন্ধু, আজকে জানি অস্থির
রক্ত, নদীর জল,
নীড়ে পাখি আর সমুদ্র চঞ্চল।
বন্ধু, সময় হয়েছে এখনো
ঠিকানা অবজ্ঞাত
বন্ধু, তোমার ভুল হয় কেন এত?
আর কতদিন দুচক্ষু কচ্‌লাবে,
জালিয়ানওয়ালায় যে-পথের শুরু
সে-পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের পথ ধ'রে ভাই
ধর্মতলার পরে,
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে।

বন্ধু, আজকে বিদায়! দেখেছ
উঠল যে হাওয়া ঝড়ো,
ঠিকানা রইল,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা ক'রো ॥

লেনিন

লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।
আজকেও রুশিয়ার গ্রামে ও নগরে
হাজার লেনিন যুদ্ধ করে,
মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।
বিদ্যুৎ-ইশারা চোখে, আজকেও অযুত লেনিন
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতীক্ষিত দিন—
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ;
—আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।

সযত্ন মুখোশধারী ধনিকেরও বন্ধ আস্ফালন,
কাঁপে হৃৎযন্ত্র তার, চোখেমুখে চিহ্নিত মরণ।
বিপ্লব হয়েছে শুরু, পদানত জনতার ব্যগ্র গাত্রোত্থানে,
দেশে দেশে বিস্ফোরণ অতর্কিতে অগ্ন্যুৎপাত হানে।
দিকে দিকে কোণে কোণে লেনিনের পদধ্বনি
আজো যায় শোনা
দলিত হাজার কণ্ঠে বিপ্লবের আজো সম্বর্ধনা।
পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে,
লেনিন সমৃদ্ধ হয় সম্ভাবিত উর্বর জঠরে।
আশ্চর্য উদ্দাম বেগে বিপ্লবের প্রত্যেক আকাশে
লেনিনের সূর্যদীপ্তি রক্তের তরঙ্গে ভেসে আসে;
ইতালি, জার্মান, জাপ, ইংলন্ড, আমেরিকা, চীন,
যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন।
অন্ধকার ভারতবর্ষ, বুভুক্ষায় পথে মৃতদেহ—
অনৈক্যের চোরাবালি; পরস্পর অযথা সন্দেহ;

দরজায় চিহ্নিত নিত্য শত্রুর উদ্ধত পদাঘাত,
অদৃষ্ট ভর্ৎসনা-ক্লান্ত কাটে দিন, বিমর্ষ রাত
বিদেশি শৃঙ্খলে পিষ্ট, শ্বাস তার ক্রমাগত ক্ষীণ—
এখানেও আয়োজন পূর্ণ করে নিঃশব্দে লেনিন।

লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জানায় প্রতিবাদ।
মৃত্যুর সমুদ্র শেষ; পালে লাগে উদ্দাম বাতাস
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে, আন্দোলিত ঘাস।
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন ॥

দেশলাই কাঠি

আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি
এত নগণ্য, হয়তো চোখেও পড়ি না;
তবু জেনো
মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ—
বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস;
আমি একটা দেশলাইয়ের কাঠি।

মনে আছে সেদিন হুলুস্থুল বেঁধেছিল?
ঘরের কোণে জ্বলে উঠেছিল আগুন—
আমাকে অবজ্ঞাভরে না-নিভিয়ে ছুড়ে ফেলায়!
কত ঘরকে দিয়েছি পুড়িয়ে,
কত প্রাসাদকে করেছি ধূলিসাৎ;
আমি একাই—ছোট্ট একটা দেশলাই কাঠি।

এমনি বহু নগর, বহু রাজ্যকে দিতে পারি ছারখার করে।
তবুও অবজ্ঞা করবে আমাদের?
মনে নেই? এই সেদিন—
আমরা সবাই জ্বলে উঠেছিলাম একই বাক্সে;
চমকে উঠেছিলে—
আমরা শুনেছিলাম তোমাদের বিবর্ণ মুখের আর্তনাদ!

আমাদের কী অসীম শক্তি
তা তো অনুভব করেছ বারংবার;
তবু কেন বোঝ না,
আমরা বন্দি থাকব না তোমাদের পকেটে পকেটে,
আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমরা ছড়িয়ে পড়ব
শহরে, গঞ্জে, গ্রামে—দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

আমরা বারবার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়—
তা তো তোমরা জানোই।
কিন্তু তোমরা তো জানো না;
কবে আমরা জ্বলে উঠব—
সবাই—শেষবারের মতো!

বিবৃতি

আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।

আহার্যের অন্বেষণে প্রতি মনে আদিম আগ্রহ
রাস্তায় রাস্তায় আনে প্রতিদিন নগ্ন সমারোহ;
বুভুক্ষা বেঁধেছে বাসা পথের দু-পাশে,
প্রত্যহ বিষাক্ত বায়ু ইতস্তত ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে।

মধ্যবিত্ত ধূর্ত মুখ ক্রমে ক্রমে আবরণহীন
নিঃশব্দে ঘোষণা করে দারুণ দুর্দিন,
পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা চলে,
দুর্ভিক্ষ গুঞ্জন তোলে আতঙ্কিত অন্দরমহলে।
দুয়ারে দুয়ারে ব্যগ্র উপবাসী প্রত্যাশীর দল,
নিষ্ফল প্রার্থনা-ক্লান্ত, তীব্র ক্ষুধা অন্তিম সম্বল,
রাজপথে মৃতদেহ উগ্র দিবালোকে,
বিস্ময় নিক্ষেপ করে অনভ্যস্ত চোখে।

পরন্তু এদেশে আজ হিংস্র শত্রু আক্রমণ করে,
বিপুল মৃত্যুর স্রোত টান দেয় প্রাণের শিকড়ে,

নিয়ত অন্যায় হানে জরাগ্রস্ত বিদেশি শাসন,
ক্ষীণায়ু কোষ্ঠীতে নেই ধ্বংস-গর্ভ সংকট-নাশন।
সহসা অনেক রাত্রে দেশদ্রোহী ঘাতকের হাতে
দেশপ্রেমে দৃপ্ত প্রাণ রক্ত ঢালে সূর্যের সাক্ষাতে।

তবুও প্রতিজ্ঞা ফেরে বাতাসে নিভৃত,
এখানে চল্লিশ কোটি এখনো জীবিত,
ভারতবর্ষের 'পরে গলিত সূর্য ঝরে আজ—
দিগ্বিদিকে উঠেছে আওয়াজ,
রক্তে আন লাল;
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।
উদ্ধত প্রাণের বেগে উন্মুখর আমার এ-দেশ,
আমার বিধ্বস্ত প্রাণে দৃঢ়তার এসেছে নির্দেশ।

আজকে মজুর ভাই দেশময় তুচ্ছ করে প্রাণ,
কারখানায় কারখানায় তোলে ঐকতান।
অভুক্ত কৃষক আজ সূচিমুখ লাঙলের মুখে

নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গি কাব্য এ-মাটির বুকে।
আজকে আসন্ন মুক্তি দূর থেকে দৃষ্টি দেয় শ্যেন,
এদেশে ভাণ্ডার ভ'রে দেবে জানি নতুন যুক্রেন।

নিরন্ন আমার দেশে আজ তাই উদ্ধত জেহাদ,
টলমল এ দুর্দিন, থরোথরো জীর্ণ বুনিয়াদ।
তাই তো রক্তের স্রোতে শুনি পদধ্বনি।
বিক্ষুব্ধ টাইফুন-মত্ত চঞ্চল ধমনী

বিপন্ন পৃথ্বীর আজ শুনি মুহুর্মুহু ডাক।
আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠাক।
ফিরুক দুয়ার থেকে সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়ানা,
ব্যর্থ হোক কু-চক্রান্ত, অবিরাম বিপক্ষের হানা ॥

চিল

পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখলাম :
ফুটপাতে এক মরা চিল!
চমকে উঠলাম ওর করুণ বীভৎস মূর্তি দেখে।
অনেক উঁচু থেকে যে এই পৃথিবীটাকে দেখেছে,
লুণ্ঠনের অবাধ উপনিবেশ;
যার শ্যেন দৃষ্টিতে কেবল ছিল
তীব্র লোভ আর ছোঁ মারার দস্যু প্রবৃত্তি—
তাকে দেখলাম, ফুটপাতে মুখ গুঁজে প'ড়ে।

গম্বুজশিখরে বাস করত এই চিল,
নিজেকে জাহির করত সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে;
হালকা হাওয়ায় ডানা মেলে দিত আকাশের নীলে—
অনেককে ছাড়িয়ে; একক :
পৃথিবী থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে।

অনেকে আজ নিরাপদ;
নিরাপদ ইঁদুরছানারা আর খাদ্য-হাতে ত্রস্ত পথচারী
নিরাপদ—কারণ আজ সে মৃত।
আজ আর কেউ নেই ছোঁ মারার,
ওরই ফেলে-দেওয়া উচ্ছিষ্টের মতো
ও পড়ে রইল ফুটপাতে,
শুক্‌নো, শীতল, বিকৃত দেহে।

হাতে যাদের ছিল প্রাণধারণের খাদ্য
বুকের কাছে সযত্নে চেপে ধরা—

তারা আজ এগিয়ে গেল নির্ভয়ে;
নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতো পিছনে ফেলে
আকাশচ্যুত এক উদ্ধত চিলকে॥

বোধন

হে মহামানব, একবার এস ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার;
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ, স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি;
কোথাও নেই কো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

ব্যাহত জীবনযাত্রা, চুপি চুপি কান্না বও বুকে,
হে নীড়-বিহারী সঙ্গী। আজ শুধু মনে মনে ধুঁকে
ভেবেছ সংসারসিন্ধু কোনোমতে হয়ে যাবে পার
পায়ে পায়ে বাধা ঠেলে। তবু আজো বিস্ময় আমার—
ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস।
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।
তোমার ক্ষেতের শস্য
চুরি ক'রে যারা গুপ্তকক্ষতে জমায়
তাদেরই দু-পায়ে প্রাণ ঢেলে দিলে দুঃসহ ক্ষমায়;
লোভের পাপের দুর্গ গম্বুজ ও প্রাসাদে মিনারে
তুমি যে পেতেছ হাত; আজ মাথা ঠুকে বারে বারে
অভিশাপ দাও যদি, বারংবার হবে তা নিষ্ফল—
তোমার অন্যায়ে জেনো এ অন্যায় হয়েছে প্রবল।

তুমি তো প্রহর গোনো,
তারা মুদ্রা গোনে কোটি কোটি,
তাদের ভাণ্ডার পূর্ণ; শূন্য মাঠে কঙ্কাল করোটি
তোমাকে বিদ্রূপ করে, হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে—
কুজ্‌ঝটি তোমার চোখে, তুমি ঘুরে ফেরো দুর্বিপাকে।

পৃথিবী উদাস, শোনো হে দুনিয়াদার!
সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু-কালো পাহাড়
দগ্ধ হৃদয়ে যদিও ফেরাও ঘাড়
সামনে পেছনে কোথাও পাবে না পার :
কী করে খুলবে মৃত্যু ঠেকানো দ্বার—
এই মুহূর্তে জবাব দেবে কি তার?

লক্ষ লক্ষ প্রাণের দাম
অনেক দিয়েছি; উজাড় গ্রাম।
সুদ ও আসলে আজকে তাই
যুদ্ধ শেষের প্রাপ্য চাই।
কৃপণ পৃথিবী, লোভের অস্ত্র
নিয়ে কেড়ে নেয় অন্নবস্ত্র,
লোলুপ রসনা মেলা পৃথিবীতে
বাড়াও ও-হাত তাকে ছিঁড়ে নিতে।

লোভের মাথায় পদাঘাত হানো—
আনো, রক্তের ভাগীরথী আনো।
দৈত্যরাজের যত অনুচর
মৃত্যুর ফাঁদ পাতে পর পর;
মেলো চোখ আজ, ভাঙো সে ফাঁদ—
হাঁকো দিকে দিকে সিংহনাদ।
তোমার ফসল, তোমার মাটি
তাদের জীয়ন ও মরণকাঠি
তোমার চেতনা চালিত হাতে—
এখনও কাঁপবে আশঙ্কাতে?
স্বদেশপ্রেমের ব্যাঙ্গমা পাখি
মারণমন্ত্র বলে, শোনো তা কি?
এখনো কি তুমি আমি স্বতন্ত্র?
করো আবৃত্তি, হাঁকো সে মন্ত্র,

শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার?

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে-কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই

স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।
শোন্ রে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।

তারপর বহুশত যুগ পরে
ভবিষ্যতের কোনো জাদুঘরে।
নৃতত্ত্ববিদ্ হয়রান হয়ে মুছবে কপাল তার,
মজুতদার ও মানুষের হাড়ে মিল খুঁজে পাওয়া ভার।
তের-শ সালের মধ্যবর্তী মালিক, মজুতদার
মানুষ ছিল কি? জবাব মেলে না তার।

আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়,
দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড়;
আজকের নৈঃশব্দ্য হোক যুদ্ধারম্ভের স্বীকৃতি।
দু-হাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা,
প্রার্থনা করো :
হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা—
আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার গলানো উত্তাপ।
টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসনের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।
তা যদি না হয়, মাথার উপরে ভয়ংকর
বিপদ নামুক, ঝড়ে বন্যায় ভাঙুক ঘর;
তা যদি না হয়, বুঝব তুমি তো মানুষ নও—
গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বও
ভারতবর্ষ মাটি দেয় নি কো, দেয় নি জল
দেয় নি তোমার মুখেতে অন্ন, বাহুতে বল
পূর্বপুরুষ অনুপস্থিত রক্তে, তাই
ভারতবর্ষে আজকে তোমার নেই কো ঠাঁই।

ইউরোপের উদ্দেশে

ওখানে এখন মে-মাস তুষার গলানো দিন,
এখানে অগ্নিঝরা বৈশাখ নিদ্রাহীন;

হয়তো ওখানে শুরু মন্থর দক্ষিণ হাওয়া;
এখানে বোশেখি ঝড়ের ঝাপটা পশ্চাৎ ধাওয়া;
এখানে সেখানে ফুল ফোটে আজ তোমাদের দেশে
কত রঙ, কত বিচিত্র নিশি দেখা দেয় এসে।
ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে কত ছেলে-মেয়ে
এই বসন্তে কত উৎসব কত গান গেয়ে।
এখানে তো ফুল শুকানো, ধূসর রঙের ধুলায়
খাঁ-খাঁ করে সারা দেশটা, শান্তি গিয়েছে চুলোয়
কঠিন রোদের ভয়ে ছেলে-মেয়ে বন্ধ ঘরে,
সব চুপচাপ : জাগবে হয়তো বোশেখি ঝড়ে।
অনেক খাটুনি, অনেক লড়াই করার শেষে
চারিদিকে ক্রমে ফুলের বাগান তোমাদের দেশে;
এদেশে যুদ্ধ, মহামারী, ভুখা জ্বলে হাড়ে হাড়ে—
অগ্নিবর্ষী গ্রীষ্মের মাঠে তাই ঘুম কাড়ে
বেপরোয়া প্রাণ; জমে দিকে দিকে আজ লাখে লাখ—
তোমাদের দেশে মে-মাস; এখানে ঝ'ড়ো বৈশাখ ॥

প্রস্তুত

কালো মৃত্যুরা ডেকেছে আজকে স্বয়ম্বরায়,
নানাদিকে নানা হাতছানি দেখি বিপুল ধরায়।
ভীত মন খোঁজে সহজ পন্থা, নিষ্ঠুর চোখ;
তাই বিষাক্ত আস্বাদময় এ-মর্ত্যলোক,
কেবলি এখানে মনের দ্বন্দ্ব আগুন ছড়ায়।

অবশেষে ভুল ভেঙেছে, জোয়ার মনের কোণে,
তীব্র ভ্রুকুটি হেনেছি কুটিল ফুলের বনে;
অভিশাপময় যেসব আত্মা আজো অধীর,
তাদের সকাশে রেখেছি প্রাণের দৃঢ় শিবির;
নিজেকে মুক্ত করেছি আত্মসমর্পণে।

চাঁদের স্বপ্নে ধুয়ে গেছে মন যে-সব দিনে,
তাদের আজকে শত্রু বলেই নিয়েছি চিনে,
হীন স্পর্ধারা ধূর্তের মতো শক্তিশেলে—
ছিনিয়ে আমায় নিতে পারে আজো সুযোগ পেলে
তাই সতর্ক হয়েছি মনকে রাখি নি ঋণে।

অসংখ্য দিন কেটেছে প্রাণের বৃথা রোদনে
নরম সোফায় বিপ্লবী মন উদ্বোধনে;

আজকে কিন্তু জনতা-জোয়ারে দোলে প্লাবন,
নিরন্ন মনে রক্তিম পথ অনুধাবন
করছে পৃথিবী পূর্ব-পন্থা সংশোধনে।

অস্ত্র ধরেছি এখন সমুখে শত্রু চাই,
মহামারণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই;
পৃথিবী জটিল, জটিল মনের সম্ভাষণ
তাদের প্রভাবে রাখি নি মনেতে কোনো আসন,
ভুল হবে জানি তাদের আজকে মনে করাই ॥

শত্রু এক

এদেশ বিপন্ন আজ; জানি আজ নিরন্ন জীবন—
মৃত্যুরা প্রত্যহ সঙ্গী, নিয়ত শত্রুর আক্রমণ
রক্তের আল্পনা আঁকে, কানে বাজে আর্তনাদ সুর;
তবুও সুদৃঢ় আমি, আমি এক ক্ষুধিত মজুর।
আমার সম্মুখে আজ এক শত্রু : এক লাল পথ,
শত্রুর আঘাত আর বুভুক্ষায় উদ্দীপ্ত শপথ।
কঠিন প্রতিজ্ঞাস্তব্ধ আমাদের দৃপ্ত কারখানায়,
প্রত্যেক নির্বাক যন্ত্র প্রতিরোধ সংকল্প জানায়।
আমার হাতের স্পর্শে প্রতিদিন যন্ত্রের গর্জন
স্মরণ করায় পণ; অবসাদ দিই বিসর্জন।
বিক্ষুব্ধ যন্ত্রের বুকে প্রতিদিন যে-যুদ্ধ ঘোষণা,
সে-যুদ্ধ আমার যুদ্ধ, তারই পথে স্তব্ধ দিন গোনা।
অদূর দিগন্তে আসে ক্ষিপ্র দিন, জয়োন্মত্ত পাখা—
আমার দৃষ্টিতে লাল প্রতিবিম্ব মুক্তির পতাকা।
আমার বেগান্ধ হাত, অবিরাম যন্ত্রের প্রসব
প্রচুর প্রচুর সৃষ্টি, শেষ বজ্র সৃষ্টির উৎসব ॥

মজুরদের ঝড়

(ল্যাংস্টন হিউজ)

এখন এই তো সময়—
কই? কোথায়? বেরিয়ে এস, ধর্মঘটভাঙা দালালরা।
সেই সব দালালরা—
ছেলেদের চোখের মতো যাদের ভোল বদলায়,
বেরিয়ে এস! জাহান্নামে-যাওয়া মূর্খের দল,

বিচ্ছিন্ন, তিক্ত, দুর্বোধ্য
পরাজয় আর মৃত্যুর দূত—বেরিয়ে এস!
বেরিয়ে এস, শক্তিমান আর অর্থলোভীর দল
সংকীর্ণ গলির বিষাক্ত নিশ্বাস নিয়ে।
গর্তের পোকারা!
এই তো তোমাদের শুভক্ষণ,
গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো—
আর বেরিয়ে পড়ো ছোট ছোট সাপেরা—
বড় আর মোটা সাপেদের যারা ঘিরে থাকো।
সময় হয়েছে, আসরফি আর পুরনো অপমানের বদলে
সাদা যাদের পেট—
বংশগত সরীসৃপ দাঁত তারা বের করুক,
এই তো তাদের সুযোগ।
মানুষ ভালো করেই জানে
অনেক মানুষের বিরুদ্ধে একজনকে লাগানোর সেই
পুরনো কায়দা।
সামান্য কয়েকজন লোভী অনেক অভাবীর বিরুদ্ধে—
আর স্বাস্থ্যবানদের বিরুদ্ধে ক্ষয়ে-যাওয়া দল।
সূর্যালোকের পথে যাদের যাত্রা
তাদের বিরুদ্ধে তাই সাপেরা।

অতীতে অবশ্য এই সাপেরা জিতেছে বহুবার।
কিন্তু এখনই সেই সময়,
সচেতন মানুষ! এখন আর ভুল ক'রো না—
বিশ্বাস ক'রো না সেই সব সাপেদের
জমকালো চামড়ায় যারা নিজেদের ঢেকে রাখে,
বিপদে পড়লে যারা ডাকে
তাদের চেয়ে কম চটকদার বিষাক্ত অনুচরদের।
এতটুকু লজ্জা হয় না তাদের ধর্মঘট ভাঙতে
যে-ধর্মঘট বেআব্রু ক্ষুধার চূড়ান্ত চিহ্ন।

—অবশ্য, এখনো কোনো সম্মানিত প্রতিষ্ঠান হয় নি
যার অজ্ঞাত নাম : 'ধর্মঘট ভাঙার দল'
অন্তত দরজায় সে নাম লেখা থাকে না।
ঝড় আসছে—সেই ঝড়,
যে-ঝড় পৃথিবীর বুক থেকে জঞ্জালদের টেনে তুলবে!
আর হুশিয়ার মজুর!
সে-ঝড় প্রায় মুখোমুখি।

ডাক

মুখে-মৃদুহাসি অহিংস বুদ্ধের
ভূমিকা চাই না। ডাক ওঠে যুদ্ধের।
গুলি বেঁধে বুকে, উদ্ধত তবু মাথা—
হাতে হাতে ফেরে দেনা-পাওনার খাতা।
শোনো, হুঙ্কার কোটি অবরুদ্ধের!

দুর্ভিক্ষকে তাড়াও, ওদেরও তাড়াও—
সন্ধিপত্র মাড়াও, দু-পায়ে মাড়াও।
তিন-পতাকার মিনতি : দেবে না সাড়াও?
অসহ্য জ্বালা কোটি কোটি ক্রুদ্ধের।

ক্ষতবিক্ষত নতুন সকালবেলা,
শেষ করব এ রক্তের হোলিখেলা,
ওঠ সোজা হয়ে, পায়ে পায়ে লাগে ঠেলা
দেখ, ভিড় দেখ স্বাধীনতালুব্ধের।

ফাল্গুন মাস, ঝরুক জীর্ণ পাতা
গজাক নতুন পাতারা, তুলুক মাথা,
নতুন দেয়ালে দিকে দিকে হোক গাঁথা—
জাগে বিক্ষোভ চারিপাশে ক্ষুব্ধের।

হৃদে তৃষ্ণার জল পাবে কত কাল?
সম্মুখে টানে সমুদ্র উত্তাল;
তুমি কোন্ দলে? জিজ্ঞাসা উদ্দাম :
গুণ্ডার দলে আজো লেখাও নি নাম?

কৃষকের গান

এ-বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে
এইবার ফলাব ফসল—
আমার এ বলিষ্ঠ বাহুতে
আজ তার নির্জন বোধন।
এ-মাটির গর্ভে আজ আমি
দেখেছি আসন্ন জন্মেরা
ক্রমশ সুপুষ্ট ইঙ্গিতে :

দুর্ভিক্ষের অন্তিম কবর।
আমার প্রতিজ্ঞা শুনেছ কি?

(গোপন একান্ত এক পণ)
এ মাটিতে জন্ম দেব আমি
অগণিত পল্টন-ফসল।
ঘনায় ভাঙন দুই চোখে
ধ্বংসস্রোত জনতা জীবনে;
আমার প্রতিজ্ঞা গড়ে তোলে
ক্ষুধিত সহস্র হাতছানি।
দুয়ারে শত্রুর হানা
মুঠিতে আমার দুঃসাহস।
কর্ষিত মাটির পথে পথে
নতুন সভ্যতা গড়ে পথ॥

ফসলের ডাক : ১৩৫১

কাস্তে দাও আমার এ-হাতে—
সোনালি সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেব তাতে।

শক্তির উন্মুখ হাওয়া আমার পেশিতে
স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেখি চেতনার বিদ্যুৎ বিকাশ;
দু-পায়ে অস্থির আজ বলিষ্ঠ কদম;
কাস্তে দাও আমার এ-হাতে।

দু-চোখে আমার আজ বিচ্ছুরিত মাঠের আগুন,
নিঃশব্দে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তরঙ্গিত প্রাণের জোয়ার
মৌসুমি হাওয়ায় আসে জীবনের ডাক :
শহরের চুল্লি ঘিরে পতঙ্গের কানে।

বহুদিন উপবাসী নিঃস্ব জনপদে,
মাঠে মাঠে আমাদের ছড়ানো সম্পদ;
কাস্তে দাও আমার এ-হাতে।
মনে আছে একদিন তোমাদের ঘরে
নবান্ন উজাড় ক'রে পাঠিয়েছি সোনার বছরে,
নির্ভাবনার হাসি ছড়িয়েছি মুখে
তৃপ্তির প্রগাঢ় চিহ্ন এনেছি সম্মুখে,
সেদিনের অলক্ষ্য সেবার বিনিময়ে
আজ শুধু কাস্তে দাও আমার এ-হাতে।

আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে,
তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্য-প্রখর—
যে-কাস্তে ঝলসাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে,
যে-কাস্তে শত্রুর কাছে দেখা দেবে অত্যন্ত ধারাল।

জানি আমি মৃত্যু আজ ঘুরে যায় তোমাদেরও দ্বারে
দুর্ভিক্ষ ফেলেছে ছায়া তোমাদের দৈনিক ভাণ্ডারে;
তোমাদের বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা আমার,
শুধু আজ কাস্তে দাও আমার এ-হাতে।

পরাস্ত অনেক চাষি; ক্ষিপ্রগতি নিঃশব্দ মরণ—
জ্বলন্ত মৃত্যুর হাতে দেখা গেল বুভুক্ষুর আত্মসমর্পণ,
তাদের ফসল প'ড়ে, দৃষ্টি জ্বলে সুদূরসন্ধানী
তাদের ক্ষেতের হাওয়া চুপিচুপি করে কানাকানি—
আমাকেই কাস্তে নিতে হবে।
নিয়ত আমার কানে গুঞ্জরিত ক্ষুধার যন্ত্রণা,
উদ্বেলিত হাওয়া আনে মাঠের সে উচ্ছ্বসিত ডাক,
সুস্পষ্ট আমার কাছে জীবনের সুতীব্র সংকেত :

তাই আজ একবার কাস্তে দাও আমার এ-হাতে॥

এই নবান্নে

এই হেমন্তে কাটা হবে ধান,
আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান—
পোষপার্বণে প্রাণ কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান।
তবুও এ-হাতে কাস্তে তুলতে কান্না ঘনায় :
হালকা হাওয়ায় বিগত স্মৃতিকে ভুলে থাকা দায়;
গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন,
পথে প্রান্তরে খামারে মরেছে যত পরিজন;
নিজের হাতের জমি ধান-বোনা,
বৃথাই ধুলোতে ছড়িয়েছে সোনা,
কারোরই ঘরেতে ধান তোলবার আসে নি শুভক্ষণ—
তোমার আমার ক্ষেত ফসলের অতি ঘনিষ্ঠ জন।

এবার নতুন জোরালো বাতাসে
জয়যাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে,
পিছে মৃত্যুর ক্ষতির নির্বাচন—
এই হেমন্তে ফসলেরা বলে : কোথায় আপনজন?

তারা কি কেবল লুকানো থাকবে,
অক্ষমতার গ্লানিকে ঢাকবে,
প্রাণের বদলে যারা প্রতিবাদ করেছে উচ্চারণ?

এই নবান্নে প্রতারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ?

হে মহাজীবন

হে মহামানব, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি॥

বিক্ষোভ

দৃঢ় সত্যের দিতে হবে খাঁটি দাম,
হে স্বদেশ, ফের সেই কথা জানলাম।
জানে না তো কেউ পৃথিবী উঠছে কেঁপে
ধরেছে মিথ্যা সত্যের টুঁটি চেপে,
কখনো কেউ কি ভূমিকম্পের আগে
হাতে শাঁখ নেয়, হঠাৎ সবাই জাগে?
যারা আজ এত মিথ্যার দায়ভাগী,
আজকে তাদের ঘৃণার কামান দাগি।
ইতিহাস, জানি নীরব সাক্ষী তুমি,
আমরা চেয়েছি স্বাধীন স্বদেশভূমি,
অনেকে বিরূপ, কানে দেয় হাত চাপা,
তাতেই কি হয় আসল নকল মাপা?
বিদ্রোহী মন! আজকে ক'রো না মানা,
দেব প্রেম আর পাব কলসির কাণা
দেব, প্রাণ দেব মুক্তির কোলাহলে,
জিন্ ডার্ক, যিশু, সোক্রাটিসের দলে।
কুয়াশা কাটছে, কাটবে আজ কি কাল,
ধুয়ে ধুয়ে যাবে কুৎসার জঞ্জাল,

ততদিন প্রাণ দেব শত্রুর হাতে,
মুক্তির ফুল ফুটবে সে সংঘাতে।
ইতিহাস! নেই অমরত্বের লোভ,
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ ॥

১লা মে-র কবিতা : ৪৬

লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে,
কী হবে আর কুকুরের মতো বেঁচে থাকায়?
কতদিন তুষ্ট থাকবে আর
অপরের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাড়ে?
মনের কথা ব্যক্ত করবে
ক্ষীণ অস্পষ্ট কেঁউ-কেঁউ শব্দে?
ক্ষুধিত পেটে ধুঁকে ধুঁকে চলবে কত দিন?
ঝুলে পড়া তোমার জিভ,
শ্বাসে প্রশ্বাসে ক্লান্তি টেনে কাঁপতে থাকবে কত কাল?
মাথায় মৃদু চাপড় আর পিঠে হাতের স্পর্শে
কতক্ষণ ভুলে থাকবে পেটের ক্ষুধা আর গলার শিকলকে?
কতক্ষণ নাড়তে থাকবে লেজ?

তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,

তৈরি হোক লাল আগুনে ঝল্‌সানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে ॥

বিদ্রোহের গান

বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি?
এস তবে আজ বিদ্রোহ করি,
আমরা সবাই যে-যার প্রহরী
উঠুক ডাক।

উঠুক তুফান মাটিতে পাহাড়ে
জ্বলুক আগুন গরিবের হাড়ে

কোটি করাঘাত পৌঁছোক দ্বারে—
ভীরুরা থাক।

মানব না বাধা, মানব না ক্ষতি,
চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মতি
রুখবে কে আর এ অগ্রগতি,
সাধ্য কার?

রুটি দেবে নাকো? দেবে না অন্ন?
এ-লড়াইয়ে তুমি নও প্রসন্ন?
চোখ-রাঙানিকে করি না গণ্য
ধারি না ধার।

খ্যাতির মুখেতে পদাঘাত করি,
গড়ি, আমরা যে বিদ্রোহ গড়ি,
ছিঁড়ি দু-হাতের শৃঙ্খলদড়ি,
মৃত্যুপণ।

দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে,
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে,
রক্তে রক্তে লাল হয়ে উঠে
পূর্বকোণ।

ছিঁড়ি, গোলামির দলিলকে ছিঁড়ি,
বেপরোয়াদের দলে গিয়ে ভিড়ি
খুঁজি কোন্‌খানে স্বর্গের সিঁড়ি,
কোথায় প্রাণ!

দেখব, ওপরে আজো আছে কারা,
খসাব আঘাতে আকাশের তারা,
সারা দুনিয়াকে দেব শেষ নাড়া,
ছড়াব ধান।
জানি রক্তের পিছনে ডাকবে সুখের বান॥

অনন্যোপায়

অনেক গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হল, ব্যর্থ বহু উদ্যম আমার,
নদীতে জেলেরা ব্যর্থ, তাঁতি ঘরে, নিঃশব্দ কামার,
অর্ধেক প্রাসাদ তৈরি, বন্ধ ছাত-পেটানোর গান,

চাষির লাঙল ব্যর্থ, মাঠে নেই পরিপূর্ণ ধান।
যতবার গড়ে তুলি, ততবার চকিত বন্যায়
উদ্যত সৃষ্টিকে ভাঙে পৃথিবীতে অবাধ অন্যায়।
বার বার ব্যর্থ তাই আজ মনে এসেছে বিদ্রোহ,
নির্বিঘ্নে গড়ার স্বপ্ন ভেঙে গেছে; ছিন্নভিন্ন মোহ।
আজকে ভাঙার স্বপ্ন,—অন্যায়ের দম্ভকে ভাঙার,
বিপদ ধ্বংসেই মুক্তি, অন্য পথ দেখি নাকো আর।
তাই তো তন্দ্রাকে ভাঙি, ভাঙি জীর্ণ সংস্কারের খিল,
রুদ্ধবন্দিকক্ষ ভেঙে মেলে দিই আকাশের নীল।
নির্বিঘ্ন সৃষ্টিকে চাও? তবে ভাঙো বিঘ্নের বেদিকে,
উদ্দাম ভাঙার অস্ত্র ছুড়ে ছুড়ে দাও চারিদিকে॥

কবিতার খসড়া

আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায়
কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায়
ভরে দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়,
জানে না কেউ।
উদ্যমহীন মূঢ় কারায়
পুরনো বুলির মাছি তাড়ায়
যারা, তারা নিয়ে ঘোরে পাড়ায়
স্মৃতির ফেউ॥

সূচনা

ভারতবর্ষে পাথরের গুরুভার :
এহেন অবস্থাকেই পাষাণ বলো,
প্রস্তরীভূত দেশের নীরবতার
একফোঁটা নেই অশ্রুও সম্বল।

অহল্যা হল এই দেশ কোন্ পাপে
ক্ষুধার কান্না কঠিন পাথরে ঢাকা,
কোনো সাড়া নেই আগুনের উত্তাপে
এ নৈঃশব্দ্য ভেঙেছে কালের চাকা।

ভারতবর্ষ! কার প্রতীক্ষা করো,
কান পেতে কার শুনছ পদধ্বনি?

বিদ্রোহে হবে পাথরেরা থরথর,
কবে দেখা দেবে লক্ষ প্রাণের খনি?

ভারতী, তোমার অহল্যারূপ চিনি
রামের প্রতীক্ষাতেই কাটাও কাল,
যদি তুমি পায়ে বাজাও ও-কিঙ্কিনী,
তবে জানি বেঁচে উঠবেই কঙ্কাল।

কত বসন্ত গিয়েছে অহল্যা গো,
জীবনে ব্যর্থ তুমি তবু বার বার,
দ্বারে বসন্ত, একবার শুধু জাগ
দু-হাতে সরাও পাষাণের গুরুভার।

অহল্যা-দেশ, তোমার মুখের ভাষা
অনুচ্চারিত, তবু অধৈর্যে ভরা;
পাষাণ ছদ্মবেশকে ছেঁড়ার আশা
ক্রমশ তোমার হৃদয় পাগল করা।

ভারতবর্ষ, তন্দ্রা ক্রমশ ক্ষয়
অহল্যা! আজ শাপমোচনের দিন;
তুষার-জনতা বুঝি জাগ্রত হয়—
গা-ঝাড়া দেবার প্রস্তাব দ্বিধাহীন।

অহল্যা, আজ কাঁপে কি পাষাণকায়!
রোমাঞ্চ লাগে পাথরের প্রত্যঙ্গে;
রামের পদস্পর্শ কি লাগে গায়?
অহল্যা, জেনো আমরা তোমার সঙ্গে ॥

মণিপুর

এ-আকাশ, এ-দিগন্ত, এই মাঠ, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি,
সহস্র বছর ধ'রে একে আমি জানি পরিপাটি,
জানি, এ আমার দেশ অজস্র ঐতিহ্য দিয়ে ঘেরা,
এখানে আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা।
যদিও দলিত দেশ, তবু মুক্তি কথা কয় কানে,
যুগ যুগ আমরা যে বেঁচে থাকি পতনে উত্থানে।
যে চাষি কেটেছে ধান, এ-মাটিতে নিয়েছে কবর,
এখনো আমার মধ্যে ভেসে আসে তাদের খবর।

অদৃশ্য তাদের স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন এদেশের ধূলি,
মাটিতে তাদের স্পর্শ, তাদের কেমন করে ভুলি?
আমার সম্মুখে ক্ষেত, এ-প্রান্তরে উদয়াস্ত খাটি,
ভালোবাসি এ-দিগন্ত, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি।
এখানে রক্তের দাগ রেখে গেছে চেঙ্গিস, তৈমুর,
সে চিহ্নও মুছে দিল কত উচ্চৈঃশ্রবাদের খুর।
কত যুদ্ধ হয়ে গেছে, কত রাজ্য হয়েছে উজাড়
উর্বর করেছে মাটি কত দিগ্বিজয়ীর হাড়।
তবুও অজেয় এই শতাব্দীগ্রথিত হিন্দুস্থান,
এরই মধ্যে আমাদের বিকশিত স্বপ্নের সন্ধান।
আজন্ম দেখেছি আমি অদ্ভুত নতুন এক চোখে,
আমার বিশাল দেশ আসমুদ্র ভারতবর্ষকে।
এ-ধুলোয় প্রতিরোধ, এ-হাওয়ায় ঘূর্ণিত চাবুক,
এখানে নিশ্চিহ্ন হল কত শত গর্বোদ্ধত বুক।
এ-মাটির জন্যে প্রাণ দিয়েছি তো কত যুগ ধরে,
রেখেছি মাটির মান কতবার কত যুদ্ধ ক'রে।
আজকে যখন এই দিক্‌প্রান্তে ওঠে রক্তঝড়,
কোমল মাটিতে রাখে শত্রু তার পায়ের স্বাক্ষর,
তখন চিৎকার করে রক্ত বলে ওঠে 'ধিক্ ধিক্,
এখনো দিল না দেখা দেহে দেহে নির্ভয় সৈনিক!
দাসত্বের ছদ্মবেশ দীর্ণ করে উন্মোচিত হোক
একবার বিশ্বরূপ—হে উদ্দাম, হে অধিনায়ক!'
এদিকে উৎকর্ণ দিন, মণিপুর, কাঁপে মণিপুর
চৈত্রের হাওয়ায় ক্লান্ত, উৎকণ্ঠায় অস্থির দুপুর—
কবে দেখা দেবে, কবে প্রতীক্ষিত সেই শুভক্ষণ
ছড়াবে ঐশ্বর্য পথে জনতার দুরন্ত যৌবন?
দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে অতর্কিতে শত্রু তার পদচিহ্ন রাখে—
এখনো শত্রুকে ক্ষমা? শত্রু কি করেছে ক্ষমা বিধ্বস্ত বাংলাকে?
আজকের এ মুহূর্তে অবসন্ন শ্মশানস্তব্ধতা,
কেন তাই মনে মনে আমি প্রশ্ন করি সেই কথা।
তুমি কি ক্ষুধিত বন্ধু? তুমি কি ব্যাধিতে জরোজরো?
তা হোক, তবুও তুমি আর এক মৃত্যুকে রোধ করো।
বসন্ত লাগুক আজ আন্দোলিত প্রাণের শাখায়,
আজকে আসুক বেগ এ নিশ্চল রথের চাকায়,
এ-মাটি উত্তপ্ত হোক, এ-দিগন্তে আসুক বৈশাখ,
ক্ষুধার আগুনে আজ শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।
শত্রুরা নিয়েছে আজ দ্বিতীয় মৃত্যুর ছদ্মবেশ,
তবু কেন নিরুত্তর প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা দেশ?

এদেশে কৃষক আছে, এদেশে মজুর আছে জানি,
এদেশে বিপ্লবী আছে জনরাজ্যে মুক্তির সন্ধানী।
দাসত্বের ধুলো ঝেড়ে তারা আজ আহ্বান পাঠাক,
ঘোষণা করুক তারা এ-মাটিতে আসন্ন বৈশাখ।
তাই এ অবরুদ্ধ স্বপ্নহীন নিবিড় বাতাসে
শব্দ হয়, মনে হয় রাত্রিশেষে ওরা যেন আসে।
ওরা আসে, কান পেতে আমি তার পদধ্বনি শুনি,
মৃত্যুকে নিহত ক'রে ওরা আসে উজ্জ্বল আরুণি;
পৃথিবী ও ইতিহাস কাঁপে আজ অসহ্য আবেগে,
ওদের পায়ের স্পর্শে মাটিতে সোনার ধান, রঙ লাগে মেঘে।
এ আকাশ চন্দ্রাতপ, সূর্য আজ ওদের পতাকা,
মুক্তির প্রচ্ছদপটে ওদের কাহিনী আজ ঢাকা,
আগন্তুক ইতিহাসে ওরা আজ প্রথম অধ্যায়,
ওরা আজ পলিমাটি অবিরাম রক্তের বন্যায়,
ওদের দু-চোখে আজ বিকশিত আমার কামনা,
অভিনন্দন গাছে, পথের দু-পাশে অভ্যর্থনা।
ওদের পতাকা ওড়ে গ্রামে গ্রামে নগরে বন্দরে,
মুক্তির সংগ্রাম সেরে ওরা ফেরে স্বপ্নময় ঘরে ॥

চিরদিনের

এখানে বৃষ্টিমুখর লাজুক গাঁয়ে
এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা,
সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে
পথ নেই, তবু এখানে যে পথ হাঁটা।

জোড়া দিঘি, তার পাড়েতে তালের সারি
দূরে বাঁশঝাড়ে আত্মদানের সাড়া,
পচা জল আর মশায় অহংকারী
নীরব এখানে অমর কিষানপাড়া।

এ-গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস
বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে,
গোয়ালে পাঠায় ইশারা সবুজ ঘাস
এ-গ্রাম নতুন সবুজ ঘাগরা পরে।

রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য শাঁখে
কিষানকে ঘরে পাঠায় যে আল-পথ;

বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে
সন্ধ্যা সেখানে জড়ো করে জনমত।

দুর্ভিক্ষের আঁচড় জড়ানো গায়ে
এ-গ্রামের লোক আজো সব কাজ করে,
কৃষক-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে
প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে।

রাত্রি হলেই দাওয়ায় অন্ধকারে
ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনিকে,
কেমন করে সে আকালেতে গতবারে
চলে গেল লোক দিশাহারা দিকে দিকে।

এখানে সকাল ঘোষিত পাখির গানে
কামার, কুমোর, তাঁতি তার কাজে জোটে,
সারাটা দুপুর ক্ষেতের চাষির কানে
একটানা আর বিচিত্র ধ্বনি উঠে।

হঠাৎ সেদিন জল আনবার পথে
কৃষক-বধূ সে থমকে তাকায় পাশে,
ঘোমটা তুলে সে দেখে নেয় কোনোমতে,
সবুজ ফসলে সুবর্ণ যুগ আসে ॥

কবে

অনেক স্তব্ধ দিনের এপারে চকিত চতুর্দিক,
আজো বেঁচে আছি, মৃত্যুতাড়িত আজো বেঁচে আছি ঠিক।
দুলে ওঠে দিন : শপথ মুখর কিষান-শ্রমিক পাড়া,
হাজারে হাজারে মাঠে বন্দরে আজকে দিয়েছে সাড়া।
জ্বালে আলো আজ, আমাদের হাড়ে, জমা হয় বিদ্যুৎ,
নিহত দিনের দীর্ঘ শাখায় ফোটে বসন্তদূত।
মূঢ় ইতিহাস; চল্লিশ কোটি সৈন্যের সেনাপতি!
সংহত দিন, রুখবে কে এই একত্রীভূত গতি?
জানি আমাদের অনেক যুগের সঞ্চিত স্বপ্নেরা
দ্রুত মুকুলিত তোমার দিন ও রাত্রি দিয়েই ঘেরা।
তাই হে আদিম, ক্ষতবিক্ষত জীবনের বিস্ময়,
ছড়াও প্লাবন, দুঃসহ দিন আর বিলম্ব নয়।
সারা পৃথিবীর দুয়ারে মুক্তি, এখানে অন্ধকার,
এখানে কবে আসন্ন হবে বৈতরণীর পার?

মহাত্মাজির প্রতি

চল্লিশ কোটি জনতার জানি আমিও যে একজন,
হঠাৎ ঘোষণা শুনেছি : আমার জীবনে শুভক্ষণ
এসেছে; তখনি মুছে গেছে ভীরু চিন্তার হিজিবিজি।
রক্তে বেজেছে উৎসব, আজ হাত ধরো গান্ধিজি
এখানে আমরা লড়েছি, মরেছি, করেছি অঙ্গীকার,
এ মৃতদেহের বাধা ঠেলে হব অজেয় রাজ্য পার।
এসেছে বন্যা, এসেছে মৃত্যু, পরে যুদ্ধের ঝড়,
মন্বন্তর রেখে গেছে তার পথে পথে স্বাক্ষর,
প্রতি মুহূর্তে বুঝেছি এবার মুছে নেবে ইতিহাস—
তবু উদ্দাম, মৃত্যুআহত ফেলিনি দীর্ঘশ্বাস :
নগর গ্রামের শ্মশানে শ্মশানে নিহিত অভিজ্ঞান :
বহু মৃত্যুর মুখোমুখি দৃঢ় করেছি জয়ের ধ্যান।
তাই তো এখানে আজ ঘনিষ্ঠ স্বপ্নের কাছাকাছি,
মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে আছি—
তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে,
তোমাকে গড়ব প্রাচীর, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।
দিক্‌দিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠালে ডাক,
তাই তো আজকে গ্রামে ও নগরে স্পন্দিত লাখে লাখ ॥

পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে

আমার প্রার্থনা শোনো পঁচিশে বৈশাখ,
আর একবার জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের।
হতাশায় স্তব্ধ বাক্য; ভাষা চাই আমরা নির্বাক,
পাঠাব মৈত্রীর বাণী সারা পৃথিবীকে জানি ফের।
রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমাদের ভাষা যাবে শোনা
ভেঙে যাবে রুদ্ধশ্বাস নিরুদ্যম সুদীর্ঘ মৌনতা
আমাদেরই দুঃখসুখে ব্যক্ত হবে প্রত্যেক রচনা
পীড়নের প্রতিবাদে উচ্চারিত হবে সব কথা।

আমি দিব্য চোখে দেখি অনাগত সে রবীন্দ্রনাথ
দস্যুতায় দৃপ্তকণ্ঠ (বিগত দিনের)
ধৈর্যের বাঁধন যার ভাঙে দুঃশাসনের আঘাত,
যন্ত্রণায় রুদ্ধবাক্, যে যন্ত্রণা সহায়হীনের।
বিগত দুর্ভিক্ষে যার উত্তেজিত তিক্ত তীব্র ভাষা
মৃত্যুতে ব্যথিত আর লোভের বিরুদ্ধে খরধার,

ধ্বংসের প্রান্তরে বসে আনে দৃঢ় অনাগত আশা;
তাঁর জন্ম অনিবার্য, তাঁকে ফিরে পাবই আবার।

রবীন্দ্রনাথের সেই ভুলে যাওয়া বাণী
অকস্মাৎ করে কানাকানি।
'দামামা ঐ বাজে, দিন বদলের পালা
এলো ঝড়ো যুগের মাঝে'।

নিষ্কম্প গাছের পাতা, রুদ্ধশ্বাস অগ্নিগর্ভ দিন,
বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে এ আকাশ, গতিরুদ্ধ বায়ু;
আবিশ্ব জিজ্ঞাসা এক চোখেমুখে ছড়ায় রঙিন
সংশয় স্পন্দিত স্বপ্ন, ভীত আশা উচ্চারণহীন
মেলে না উত্তর কোনো, সমস্যায় উত্তেজিত স্নায়ু।
ইতিহাস মোড় ফেরে পদতলে বিধ্বস্ত বার্লিন,
পশ্চিম সীমান্তে শান্তি, দীর্ঘ হয় পৃথিবীর আয়ু,
দিকে দিকে জয়ধ্বনি, কাঁপে দিন রক্তাক্ত আভায়।
রাম-রাবণের যুদ্ধে বিক্ষত এ ভারতজটায়ু
মৃতপ্রায়, যুদ্ধাহত, পীড়নে দুর্ভিক্ষে মৌনমূক।
পূর্বাচল দীপ্ত ক'রে বিশ্বজন-সমৃদ্ধ-সভায়
রবীন্দ্রনাথের বাণী তার দাবি ঘোষণা করুক।
এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণসংগীতের সুর;
জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে।
যদিও সে অনাগত, তবু যেন শুনি তার ডাক
আমাদেরই মাঝে তাকে জন্ম দাও পঁচিশে বৈশাখ॥

মীমাংসা

আজকে হঠাৎ সাত-সমুদ্র তের নদী
পার হতে সাধ জাগে মনে, হায় তবু যদি
পক্ষপাতের বালাই না নিয়ে পক্ষিরাজ
প্রস্রবণের মতো এসে যেত হঠাৎ আজ—
তাহলে না-হয় আকাশবিহার হত সফল,
টুকরো মেঘেরা যেতে যেতে ছুঁয়ে যেত কপোল।
আর আমি বুঝি দৈত্যদলনে সাগর পার
হতাম; যেখানে দানবের দায়ে সব আঁধার।

মত্ত যেখানে দৈত্যে দৈত্যে বিবাদ ভারি :
হানাহানি নিয়ে সুন্দরী এক রাজকুমারী
(রাজকন্যার লোভ নেই,—লোভ অলঙ্কারে,
দৈত্যেরা শুধু বিবস্ত্রা ক'রে চায় তাহারে।)

আমি একজন লুপ্তবর্গ রাজার তনয়
এত অন্যায় সহ্য করব কোনোমতে নয়—
তাই আমি যেতে চাই সেখানেই যেখানে পীড়ন,
যেখানে ঝল্‌সে উঠবে আমার অসির কিরণ।

ভাঙাচোরা এক তলোয়ার আছে, (নয় দু-ধারী)
তাও হতো তবে পক্ষিরাজেরই অভাব ভারি।
তাই ভাবি আজ, তবে আমি খুঁজে নেব কৌপীন
নেব কয়েকটা বেছে জানা জানা বুলি সৌখিন ॥

জনরব

পাখি সব করে রব, রাত্রি শেষ : ঘোষণা চৌদিকে,
ভোরের কাকলি শুনি; অন্ধকার হয়ে আসে ফিকে,
আমার ঘরেও রুদ্ধ অন্ধকার, স্পষ্ট নয় আলো,
পাখিরা ভোরের বার্তা অকস্মাৎ আমাকে শোনালো।
স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠি, অন্ধকারে খাড়া করি কান—
পাখিদের মাতামাতি, শুনি মুখরিত ঐকতান;
আজ এই রাত্রিশেষে বাইরে পাখির কলরবে
রুদ্ধ ঘরে ব'সে ভাবি, হয়তো কিছু-বা শুরু হবে,
হয়তো এখনি কোনো মুক্তিদূত দুরন্ত রাখাল
মুক্তির অবাধ মাঠে নিয়ে যাবে জনতার পাল;
স্বপ্নের কুসুমকলি হয়তো বা ফুটেছে কাননে,
আমি কি খবর রাখি? আমি বদ্ধ থাকি গৃহকোণে,
নির্বাসিত মন নিয়ে চিরকাল অন্ধকারে বাসা,
তাই তো মুক্তির স্বপ্ন আমাদের নিতান্ত দুরাশা।

জন-পাখিদের কণ্ঠে তবুও আলোর অভ্যর্থনা,
দিকে দিকে প্রতিদিন অবিশ্রান্ত শুধু যায় শোনা;
এরা তো নগণ্য জানি, তুচ্ছ ব'লে ক'রে থাকি ঘৃণা,
আলোর খবর এরা কী করে যে পায় তা জানি না।

এদের মিলিত সুরে কেন যেন বুক ওঠে দুলে,
অকস্মাৎ পূর্বদিকে মনের জানালা দিই খুলে :

হঠাৎ বন্দর ছাড়া বাঁশি বুঝি বাজায় জাহাজ,
চকিতে আমার মনে বিদ্যুৎ বিদীর্ণ হয় আজ।

অদূরে হঠাৎ বাজে কারখানার পাঞ্চজন্যধ্বনি,
দেখি দলে দলে লোক ঘুম ভেঙে ছুটেছে তখনি;
মনে হয়, যদি বাজে মুক্তি-কারখানার তীব্র শাঁখ
তবে কি হবে না জমা সেখানে জনতা লাখে লাখ?
জন-পাখিদের গানে মুখরিত হবে কি আকাশ?
—ভাবে নির্বাসিত মন, চিরকাল অন্ধকারে বাস।

পাখিদের মাতামাতি : বুঝি মুক্তি নয় অসম্ভব,
যদিও ওঠে নি সূর্য, তবু আজ শুনি জনরব ॥

রৌদ্রের গান

এখানে সূর্য ছড়ায় অকৃপণ
দু-হাতে তীব্র সোনার মতন মদ,
যে সোনার মদ পান ক'রে ধানক্ষেত
দিকে দিকে তার গড়ে তোলে জনপদ।

ভারতী! তোমার লাবণ্য দেহ ঢাকে
রৌদ্র তোমায় পরায় সোনার হার,
সূর্য তোমার শুকায় সবুজ চুল
প্রেয়সী, তোমার কত-না অহংকার!

সারাটা বছর সূর্য এখানে বাঁধা
রোদে ঝলসায় মৌন পাহাড় কোনো,
অবাধ রৌদ্রে তীব্র দহন ভরা
রৌদ্রে জ্বলুক তোমার আমার মনও।

বিদেশকে আজ ডাকো রৌদ্রের ভোজে
মুঠো মুঠো দাও কোষাগার-ভরা সোনা,
প্রান্তর বন ঝলমল করে রোদে
কী মধুর আহা রৌদ্রে প্রহর গোনা।

রৌদ্রে কঠিন ইস্পাত উজ্জ্বল
ঝকমক করে ইশারা যে তার বুকে,
শূন্য নীরব মাঠে রৌদ্রের প্রজা
স্তব করে জানি সূর্যের সম্মুখে।

পথিক-বিরল রাজপথে সূর্যের
প্রতিনিধি হাঁকে আসন্ন কলরব,
মধ্যাহ্নের কঠোর ধ্যানের শেষে
জানি আছে এক নির্ভয় উৎসব।

তাই তো এখানে সূর্য তাড়ায় রাত
প্রেয়সী, তুমি কি মেঘ ভয়ে আজ ভীত?
কৌতুকছলে এ-মেঘ দেখায় ভয়,
এ ক্ষণিক মেঘ কেটে যাবে নিশ্চিত।

সূর্য, তোমায় আজকে এখানে ডাকি—
দুর্বল মন, দুর্বলতর কায়া,
আমি যে পুরনো অচল দিঘির জল
আমার এ-বুকে জাগাও প্রতিচ্ছায়া ॥

দেওয়ালি

তোর সেই ইংরেজিতে দেওয়ালির শুভেচ্ছা কামনা
পেয়েছি, তবুও আমি নিরুৎসাহে আজ অন্যমনা,
আমার নেইকো সুখ, দীপান্বিতা লাগে নিরুৎসব,
রক্তের কুয়াশা চোখে, স্বপ্নে দেখি শব আর শব।
এখানে শুয়েই আমি কানে শুনি আর্তনাদ খালি,
মুমূর্ষু কলকাতা কাঁদে, কাঁদে ঢাকা, কাঁদে নোয়াখালি,
সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়ায় বর্বরতা :
এমন দুঃসহ দিনে ব্যর্থ লাগে শুভেচ্ছার কথা;
তবু তোর রঙচঙে সুমধুর চিঠির জবাবে
কিছু আজ বলা চাই, নইলে যে প্রাণের অভাবে
পৃথিবী শুকিয়ে যাবে, ভেসে যাবে রক্তের প্লাবনে।
যদিও সর্বদা তোর শুভ আমি চাই মনে মনে,
তবুও নতুন করে আজ চাই তোর শান্তিসুখ,
মনের আঁধারে তোর শত শত প্রদীপ জ্বলুক,
এ দুর্যোগ কেটে যাবে রাত আর কতক্ষণ থাকে?
আবার সবাই মিলবে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের ডাকে,
আমার ঐশ্বর্য নেই, নেই রঙ, নেই রোশনাই—
শুধু মাত্র ছন্দ আছে তাই দিয়ে শুভেচ্ছা পাঠাই ॥

হে পৃথিবী

হে পৃথিবী, আজিকে বিদায়
এ দুর্ভাগা চায়,
যদি কভু শুধু ভুল ক'রে
মনে রাখো মোরে,
বিলুপ্তি সার্থক মনে হবে
দুর্ভাগার।
        বিস্মৃত শৈশবে
যে আঁধার ছিল চারিভিতে
তারে কি নিভৃতে
আবার আপন ক'রে পাবো,
ব্যর্থতার চিহ্ন এঁকে যাবো,
স্মৃতির মর্মরে?
প্রভাতপাখির কলস্বরে
যে লগ্নে করেছি অভিযান,
আজ তার তিক্ত অবসান।
তবু তো পথের পাশে পাশে
প্রতি ঘাসে ঘাসে
লেগেছে বিস্ময়!
সেই মোর জয় ॥

সুতরাং

এত দিন ছিল বাঁধা সড়ক,
আজ চোখে দেখি শুধু নরক!
        এত আঘাত কি সইবে,
                যদি না বাঁচি দৈবে?
                চারিপাশে লেগে গেছে মড়ক।
বহুদিনকার উপার্জন,
আজ দিতে হবে বিসর্জন!
        নিষ্ফল যদি পন্থা;
                সুতরাং ছেঁড়া কন্থা
                মনে হয় শ্রেয় বর্জন ॥

স্বপ্নপথ

আজ রাত্রে ভেঙে গেল ঘুম,
চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম,
তন্দ্রাঘোরে দেখিলাম চেয়ে
অবিরাম স্বপ্নপথ বেয়ে
চলিয়াছে দুরাশার স্রোত,
বুকে তার বহু ভগ্ন পোত।
বিফল জীবন যাহাদের,
তারাই টানিছে তার জের;
অবিশ্রান্ত পৃথিবীর পথে,
জলে স্থলে আকাশে পর্বতে।
একদিন পথে যেতে যেতে
উষ্ণ বক্ষ উঠেছিল মেতে
যাহাদের, তারাই সংঘাতে
মৃত্যুমুখী, ব্যর্থ রক্তপাতে ॥

বুদ্বুদ মাত্র

মৃত্যুকে ভুলেছ তুমি তাই,
তোমার অশান্ত মনে বিপ্লব বিরাজে সর্বদাই।
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মৃত্যুকে স্মরণ ক'রো মনে,
মুহূর্তে মুহূর্তে মিথ্যা জীবন ক্ষরণে,—
তারি তরে পাতা সিংহাসন
রাত্রি দিন অসাধ্য সাধন।
তবু প্রচণ্ড-গতি জীবনের ধারা,
নিয়ত কালের কীর্তি দিতেছে পাহারা,
জন্মের প্রথম কাল হতে,
আমরা বুদ্বুদ মাত্র জীবনের স্রোতে।
এ পৃথিবী অত্যন্ত কুশলী,
যেখানে কীর্তির নামাবলী,
আমার স্থান নেই সেথা—
আমরা শক্তের ভক্ত, নহি তো বিজেতা ॥

আমার মৃত্যুর পর

আমার মৃত্যুর পর থেমে যাবে কথার গুঞ্জন,
বুকের স্পন্দনটুকু মূর্ত হবে ঝিল্লির ঝংকারে
জীবনের পথপ্রান্তে ভুলে যাব মৃত্যুর শঙ্কারে,
উজ্জ্বল আলোর চোখে আঁকা হবে আঁধার অঞ্জন।
পরিচয়ভারে ন্যুজ অনেকের শোকগ্রস্ত মন,
বিস্ময়ের জাগরণে ছদ্মবেশ নেবে বিলাপের
মুহূর্তে বিস্মৃত হবে সব চিহ্ন আমার পাপের।
কিছুকাল সন্তর্পণে ব্যক্ত হবে সবার স্মরণ।

আমার মৃত্যুর পর, জীবনের যত অনাদর
লাঞ্ছনার বেদনায়, স্পষ্ট হবে প্রত্যেক অন্তর ॥

তরঙ্গভঙ্গ

হে নাবিক, আজ কোন্ সমুদ্রে
এল মহাঝড়,
তারি অদৃশ্য আঘাতে অবশ
মরু-প্রান্তর।
এই ভুবনের পথে চলবার
শেষ-সম্বল
ফুরিয়েছে, তাই আজ নিরুক্ত
প্রাণ চঞ্চল।

আজ জীবনেতে নেই অবসাদ!
কেবল ধ্বংস, কেবল বিবাদ—
এই জীবনের এ কী মহা উৎকর্ষ!
পথে যেতে যেতে পায়ে পায়ে সংঘর্ষ।

(ছুটি আজ চাই ছুটি
চাই আমাদের সকালে বিকালে দুটি
নুন-ভাত, নয় আধপোড়া কিছু রুটি)।
—এ কী অবসাদ ক্লান্তি নেমেছে বুকে,
তাইতো শক্তি হারিয়েছি আজ
দাঁড়াতে পারি না রুখে।
বন্ধু, আমরা হারিয়েছি বুলি প্রাণ-ধারণের শক্তি,
তাই তো নিষ্ঠুর মনে হয় এই অযথা রক্তারক্তি।

এর চেয়ে ভালো মনে হয় আজ পুরনো দিন,
আমাদের ভালো পুরনো, চাই না বৃথা নবীন ॥

উদ্যোগ

বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।
মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোতে রুখে, তন্দ্রাকে কর ছিন্ন,
একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।
ঘরে তোল ধান, বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখ কাস্তে,
গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।
আজ দৃঢ় দাঁতে পুঞ্জিত হাতে প্রতিরোধ কর শক্ত,
প্রতি ঘাসে ঘাসে বিদ্যুৎ আসে জাগে সাড়া অব্যক্ত।
আজকে মজুর হাতুড়ির সুর ক্রমশই করে দৃপ্ত,
আসে সংহতি; শত্রুর প্রতি ঘৃণা হয় নিক্ষিপ্ত।
ভীরু অন্যায় প্রাণ-বন্যায় জেনো আজ উচ্ছেদ্য,
বিপন্ন দেশে তাই নিঃশেষে ঢালো প্রাণ দুর্ভেদ্য।
সব প্রস্তুত যুদ্ধের দূত হানা দেয় পুব-দরজায়,
ফেনি ও আসামে, চট্টগ্রামে ক্ষিপ্ত জনতা গর্জায়।
বন্ধু, তোমার ছাড় উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত ॥

জাগবার দিন আজ

জাগবার দিন আজ দুর্দিন চুপিচুপি আসছে;
যাদের চোখেতে আজো স্বপ্নের ছায়া ছবি ভাসছে—
তাদেরই যে দুর্দিন পরিণামে আরো বেশি জানবে,
মৃত্যুর সঙ্গীন তাদেরই বুকেতে শেল হানবে।
আজকের দিন নয় কাব্যের—
আজকের সব কথা পরিণাম আর সম্ভাব্যের;
শরতের অবকাশে শোনা যায় আকাশের বাঁশরী
কিন্তু বাঁশরী বৃথা, জমবে না আজ আর কোনো আসর-ই।
আকাশের প্রান্তে যে মৃত্যুর কালো পাখা বিস্তার—
মৃত্যু ঘরের কোণে, আজ আর নেই জেনো নিস্তার;
মৃত্যুর কথা আজ ভাবতেও পাও বুঝি কষ্ট
আজকের এই কথা জানি লাগবেই অস্পষ্ট,

তবুও তোমার চাই চেতনা,
চেতনা থাকলে আজ দুর্দিন আশ্রয় পেত না,
আজকে রঙিন খেলা নিষ্ঠুর হাতে কর বর্জন,
আজকে যে প্রয়োজন প্রকৃত দেশপ্রেম অর্জন;
তাই এস চেয়ে দেখি পৃথ্বী—
কোন্‌খানে ভাঙে আর কোন্‌খানে গড়ে তার ভিত্তি।
কোন্‌খানে লাঞ্ছিত মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব,
কোন্‌খানে দানবের 'মরণযজ্ঞ' চলে নিত্য;
পণ কর, দৈত্যের অঙ্গে
হানব বজ্রাঘাত, মিলব সবাই একসঙ্গে;
সংগ্রাম শুরু কর মুক্তির,
দিন নেই তর্ক ও যুক্তির।
আজকে শপথ কর সকলে
বাঁচাব আমার দেশ, যাবে না তা শত্রুর দখলে;
তাই আজ ফেলে দিয়ে তুলি আর লেখনী,
একতাবদ্ধ হও এখনি ॥

ঘুমভাঙার গান

মাথা তোল তুমি বিন্ধ্যাচল,
মোছ উদ্‌গত অশ্রুজল
যে গেল সে গেল, ভেবে কী ফল?
ভোল ক্ষত!
তুমি প্রতারিত বিন্ধ্যাচল,
বোঝ নি ধূর্ত চতুর ছল,
হাসে যে আকাশচারীর দল,
অনাহত।

শোন অবনত বিন্ধ্যাচল,
তুমি নও ভীরু বিগত বল
কাঁপে অবাধ্য হৃদয়দল
অবিরত।

কঠিন, কঠোর, বিন্ধ্যাচল,
অনেক ধৈর্যে আজো অটল
ভাঙো বিঘ্নকে : কর শিকল
পদাহত।

বিশাল, ব্যাপ্ত বিন্ধ্যাচল
দেখ সূর্যের দর্পানল;
ভুলেছে তোমার দৃঢ় কবল
বাধা যত।

সময় যে হল বিন্ধ্যাচল
ছেঁড়ো আকাশের উঁচু ত্রিপল
দ্রুত বিদ্রোহে হানো উপল
শত শত ॥

দেয়ালিকা

এক
দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে
লিখি কথা।
আমি যে বেকার পেয়েছি লেখার
স্বাধীনতা ॥

দুই
সকালে বিকালে মনের খেয়ালে
ইঁদারায়
দাঁড়িয়ে থাকলে অর্থটা তার
কী দাঁড়ায়?
তিন
কখন বাজল ছ-টা
প্রাসাদে প্রাসাদে ঝল্‌সায় দেখি
শেষ সূর্যের ছটা—
স্তিমিত দিনের উদ্ধত ঘনঘটা ॥

চার
বেজে চলে রেডিও
সর্বদা গোলমাল করতেই
'রেডি'ও ॥

পাঁচ
জাপানি গো জাপানি
ভারতবর্ষে আসতে কি শেষে
ধরে গেল হাঁপানি?

ছয়
জার্মানি গো জার্মানি
তুমি ছিলে অজেয় বীর
এ-কথা আজ আর মানি?

সাত
হে রাজকন্যে
তোমার জন্যে
এ জনারণ্যে
নেইকো ঠাঁই—
জানাই তাই ॥

আট
আঁধিয়ারে কেঁদে কয় সল্‌তে :
'চাইনে চাইনে আমি জ্বলতে'॥

মৃত পৃথিবী

পৃথিবী কি আজ শেষে নিঃস্ব
ক্ষুধাতুর কাঁদে সারা বিশ্ব,
চারিদিকে ঝরে পড়া রক্ত,
জীবন আজকে উত্ত্যক্ত।
আজকের দিন নয় কাব্যের
পরিণাম আর সম্ভাব্যের
ভয় নিয়ে দিন কাটে নিত্য,
জীবনে গোপন-দুর্বৃত্ত।

তাইতো জীবন আজ রিক্ত,
অলস হৃদয় স্বেদসিক্ত;
আজকে প্রাচীর গড়া ভিন্ন
পৃথিবী ছড়াবে ক্ষতচিহ্ন।
অগোচরে নামে হিম-শৈত্য,
কোথায় পালাবে মরু দৈত্য?
জীবন যদিও উৎক্ষিপ্ত,
তবু তো হৃদয় উদ্দীপ্ত,
বোধ হয় আগামী কোনো বন্যায়,
ভেসে যাবে অনশন, অন্যায় ॥

দুর্মর

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,
সে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।

হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকাশের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।

'হয় ধান নয় প্রাণ' এ শব্দে
সারা দেশ দিশেহারা,
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।

শাবাশ, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয় :
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রক্তে রঙিন ধান,
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলাদেশের প্রাণ ॥

অতি কিশোরের ছড়া

তোমরা আমায় নিন্দে ক'রে দাও না যতই গালি,
আমি কিন্তু মাখছি আমার গালেতে চুনকালি,
কোনো কাজটাই পারি নাকো বলতে পারি ছড়া,
পাশের পড়া পড়ি না ছাই পড়ি ফেলের পড়া।
তেতো ওষুধ গিলি নাকো, মিষ্টি এবং টক
খাওয়ার দিকেই জেনো আমার চিরকালের সখ।
বাবা-দাদা সবার কাছেই গোঁয়ার এবং মন্দ,
ভালো হয়ে থাকার সঙ্গে লেগেই আছে দ্বন্দ্ব।

পড়তে ব'সে থাকে আমার পথের দিকে চোখ,
পথের চেয়ে পথের লোকের দিকেই বেশি ঝোঁক।
হুলের কেয়ার করি নাকো মধুর জন্যে ছুটি,
যেখানে ভিড় সেইখানেতেই লাগাই ছুটোছুটি।
পণ্ডিত ও বিজ্ঞজনের দেখলে মাথা নাড়া,
ভাবি উপদেশের ষাঁড়ে করলে বুঝি তাড়া!
তাইতো ফিরি ভয়ে ভয়ে, দেখলে পরে তর্ক,
বুঝি কেবল গোময় সেটা,—নয়কো মধুপর্ক।
ভুল করি ভাই যখন তখন, শোধরাবার আহ্লাদে
খেয়ালমতো কাজ ক'রে যাই, কষ্ট পাই কি সাধে?
সোজাসুজি যা হয় বুঝি, হায় অদৃষ্ট চক্র!
আমার কথা বোঝে না কেউ, পৃথিবীটাই বক্র।

ভালো খাবার

ধনপতি পাল, তিনি জমিদার মস্ত;
সূর্য রাজ্যে তাঁর যায় নাকো অস্ত,
তার ওপর ফুলে উঠে কারখানা-ব্যাঙ্কে
আয়তনে হারালেন মোটা কোলা ব্যাঙকে।
সবার 'হুজুর' তিনি সকলের কর্তা,
হাজার সেলাম পান দিনে গড়পড়তা।
সদাই পাহারা দেয় বাইরে সেপাই তাঁর,
কাজ নেই, তাই শুধু 'খাই-খাই' বাই তাঁর,
এটা খান, সেটা খান, সব লাগে বিদ্‌ঘুটে,
টান মেরে ফেলে দেন একটু খাবার খুঁটে;
খাদ্যে অরুচি তাঁর, সব লাগে তিক্ত,
খাওয়া ফেলে ধমকান শেষে অতিরিক্ত।
দিনরাত চিৎকার : আরো বেশি টাকা চাই।
আরো কিছু তহবিলে জমা হয়ে থাকা চাই।
সব ভয়ে জড়সড়, রোগ বড় প্যাঁচানো।
খাওয়া ফেলে দিন রাত টাকা ব'লে চ্যাঁচানো।
ডাক্তার কবিরাজ ফিরে গেল বাড়িতে;
চিন্তা পাকাল জট নায়েবের দাড়িতে।
নায়েব অনেক ভেবে বলে হুজুরের প্রতি :
কী খাদ্য চাই? কী সে খেতে উত্তম অতি?
নায়েবের অনুরোধে ধনপতি চারিদিক
দেখে নিয়ে বার কয় হাসলেন ফিক্‌-ফিক্‌;

তারপর বললেন : বলা ভারি শক্ত,
সব চেয়ে ভালো খেতে গরিবের রক্ত ॥

ব্ল্যাক-মার্কেট

হাত করে মহাজন, হাত করে জোতদার,
ব্ল্যাক-মার্কেট করে ধনীরাম পোদ্দার
গরিব চাষিকে মেরে হাতখানা পাকাল
বালিগঞ্জেতে বাড়ি খান-ছয় হাঁকাল।
কেউ নেই ত্রিভুবনে, নেই কিছু অভাবও!
তবু ছাড়ল না তার লোক-মারা স্বভাবও।
একা থাকে, তাই হরি চাকরটা রক্ষী
ত্রিসীমানা মাড়ায় না তাই কাক-পক্ষী
বিশ্বে কাউকে রাম কাছে পেতে চান্ না,
হরিই বাজার করে, সে-ই করে রান্না।
এমনি করেই বেশ কেটে যাচ্ছিল কাল,
হঠাৎ হিসেবে রাম দেখলেন গোলমাল,
বললেন চাকরকে : কিরে ব্যাটা, কী ব্যাপার?
এত টাকা লাগে কেন বাজারেতে রোজকার?
আলু তিন টাকা সের? পটল পনের আনা?
ভেবেছিস বাজারের কিছু বুঝি নেই জানা?
রোজ রোজ চুরি তোর? হতভাগা, বজ্জাত!
হাসছিস? এক্ষুনি ভেঙে দেব সব দাঁত।
খানিকটা চুপ করে বলল চাকর হরি :
আপনারই দেখাদেখি ব্ল্যাক-মার্কেট করি ॥

সিপাহি বিদ্রোহ

হঠাৎ দেশে উঠল আওয়াজ—'হো-হো, হো-হো, হো-হো'
চমকে সবাই তাকিয়ে দেখে—সিপাহি বিদ্রোহ!
আগুন হয়ে সারাটা দেশ ফেটে পড়ল রাগে,
ছেলে বুড়ো জেগে উঠল নব্বই সন আগে;
একশ বছর গোলামিতে সবাই তখন ক্ষিপ্ত,
বিদেশিদের রক্ত পেলে তবেই হবে তৃপ্ত!
নানা সাহেব, তাঁতিয়াটোপি, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মী—
সবার হাতে অস্ত্র, নাচে বনের পশু-পক্ষী।
কেবল ধনী, জমিদার, আর আগের রাজার ভক্ত

যোগ দিল, তা নয়কো, দিল গরিবের-ও রক্ত।
সবাই জীবন তুচ্ছ করে, মুসলমান ও হিন্দু;
সবাই দিতে রাজি তাদের প্রতি রক্তবিন্দু,
ইতিহাসের পাতায় তোমরা পড় কেবল মিথ্যে,
বিদেশিরা ভুল বোঝাতে চায় তোমাদের চিত্তে।
অত্যাচারী নয়কো তারা অত্যাচারীর মুণ্ড
চেয়েছিল ফেলতে ছিঁড়ে জ্বালিয়ে অগ্নিকুণ্ড।
নানা জাতের নানান সেপাই গরিব এবং মূর্খ :
সবাই তারা বুঝেছিল অধীনতার দুঃখ;
তাইতো তারা স্বাধীনতার প্রথম লড়াই লড়তে
এগিয়েছিল, এগিয়েছিল মরণ বরণ করতে;

আজকে যখন স্বাধীন হবার শেষ লড়াইয়ের ডঙ্কা
উঠছে বেজে, কোনোদিকেই নেইকো কোনো শঙ্কা;
জব্বলপুরে সেপাইদেরও উঠছে বেজে বাদ্য
নতুন করে বিদ্রোহ আজ; কেউ নয়কো বাধ্য,
তখন এঁদের স্মরণ করো, স্মরণ করো নিত্য—
এঁদের নামে, এঁদের পণে শানিয়ে তোল চিত্ত।
নানাসাহেব, তাঁতিয়াটোপি, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মী,
এঁদের নামে, দৃপ্ত কিশোর, খুলবে তোমার চোখ কি?

পুরনো ধাঁধা

বলতে পার বড় মানুষ মোটর কেন চড়বে?
গরিব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?
বড়মানুষ ভোজের পাতে ফেলে লুচি-মিষ্টি,
গরিবরা পায় খোলামকুচি, এ কী অনাসৃষ্টি?
বলতে পার ধনীর বাড়ি তৈরি যারা করছে,
কুঁড়েঘরেই তারা কেন মাছির মতো মরছে?
ধনীর মেয়ের দামি পুতুল হরেক রকম খেলনা,
গরিব মেয়ে পায় না আদর, সবার কাছে ফ্যালনা।
বলতে পার ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য,
ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য?
'হিং-টিং-ছট্' প্রশ্ন এসব, মাথার মধ্যে কামড়ায়,
বড়লোকের ঢাক তৈরি গরিব লোকের চামড়ায় ॥

মেয়েদের পদবি

মেয়েদের পদবিতে গোলমাল ভারি,
অনেকের নামে তাই দেখি বাড়াবাড়ি;
'আ' কার অন্ত দিয়ে মহিলা করার
চেষ্টা হাসির। তাই ভূমিকা ছড়ার।
'গুপ্ত' 'গুপ্তা' হয় মেয়েদের নামে,
দেখেছি অনেক চিঠি, পোস্টকার্ড, খামে।
সে নিয়মে যদি আজ 'ঘোষ' হয় 'ঘোষা',
তা হলে অনেক মেয়ে করবেই গোঁসা,
'পালিত' 'পালিতা' হলে 'পাল' হলে 'পালা'
নির্ঘাৎ বাড়বেই মেয়েদের জ্বালা;
'মল্লিক' 'মল্লিকা', হলে 'দাস' হলে 'দাসা'
শোনাবে পদবিগুলো অতিশয় খাসা,
'কর' যদি 'করা' হয় 'ধর' হয় 'ধরা',
মেয়েরা দেখবে এই পৃথিবীটা—'সরা'।
'নাগ' যদি 'নাগা' হয় 'সেন' হয় 'সেনা',
বড়ই কঠিন হবে মেয়েদের চেনা ॥

খাদ্য সমস্যার সমাধান

বন্ধু :
ঘরে আমার চাল বাড়ন্ত
তোমার কাছে তাই,
এলাম ছুটে, আমায় কিছু
চাল ধার দাও ভাই।

মজুতদার :
দাড়াও তবে, বাড়ির ভেতর
একটু ঘুরে আসি,
চালের সঙ্গে ফাউও পাবে
ফুটবে মুখে হাসি।

মজুতদার :
এই নাও ভাই, চালকুমড়ো
আমায় খাতির কর,
চালও পেলে, কুমড়ো পেলে
লাভটা হল বড় ॥

বিয়েবাড়ির মজা

বিয়েবাড়ি : বাজছে সানাই, বাজছে নানান বাদ্য
একটি ধারে তৈরি হচ্ছে নানারকম খাদ্য;
হৈ-চৈ আর চেঁচামেচি, আসছে লুচির গন্ধ,
আলোয় আলোয় খুশি সবাই, কান্নাকাটি বন্ধ;
বাসরঘরে সাজছে কনে, সকলে উৎফুল্ল,
লোকজনকে আসতে দেখে কর্তার মুখ খুলল :
'আসুন, আসুন—বসুন সবাই, আজকে হলাম ধন্য,
যৎসামান্য এই আয়োজন আপনাদেরই জন্য;
মাংস, পোলাও, চপ-কাটলেট, লুচি এবং মিষ্টি
খাবার সময় এদের প্রতি দেবেন একটু দৃষ্টি।'
বর আসে নি, তাই সকলে ব্যস্ত এবং উৎসুক,
আনন্দে আজ বুক সকলের নাচছে কেবল ধুক্‌ধুক্‌,
'উলু' দিতে তৈরি সবাই, শাঁখ হাতে সব প্রস্তুত,
সময় চলে যাচ্ছে ব'লে মনটা করছে খুঁতখুঁত।
ভাবছে সবাই কেমন ক'রে বরকে করবে জব্দ,
হঠাৎ পাওয়া গেল পথের মোড়ে গাড়ির শব্দ।
উলুধ্বনি উঠল মেতে, শাঁখ বাজল জোরে,
বরকে সবাই এগিয়ে নিতে গেল পথের মোড়ে।
কোথায় বরের সাজসজ্জা? কোথায় ফুলের মালা?
সবাই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, পালা, পালা পালা।
বর নয় কো, লাল পাগড়ি পুলিশ আসছে নেমে!
বিয়েবাড়ির লোকগুলো সব হঠাৎ উঠল ঘেমে।
বললে পুলিশ : এই কি কর্তা, ক্ষুদ্র আয়োজন?
পঞ্চাশ জন কোথায়? এ যে দেখছি হাজার জন!
এমনি করে চাল নষ্ট দুর্ভিক্ষের কালে?
থানায় চল, কাজ কি এখন এইখানে গোলমালে?
কর্তা হলেন কাঁদো-কাঁদো, চোখেতে জল আসে,
গেটের পাশে জড়ো-হওয়া কাঙালিরা হাসে ॥

জ্ঞানী

বরেনবাবু মস্ত জ্ঞানী, মস্ত বড় পাঠক,
পড়েন তিনি দিনরাত্তির গল্প এবং নাটক।
কবিতা আর উপন্যাসে বেজায় তিনি ভক্ত,
ডিটেকটিভের কাহিনীতে গরম করেন রক্ত।
জানেন তিনি দর্শন আর নানা রকম বিজ্ঞান,

জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন তিনি, তাইতো আছে দিক্-জ্ঞান;
ইতিহাস আর ভূগোলেতে বেজায় তিনি দক্ষ,—
এসব কথা ভাবলেই তার ফুলতে থাকে বক্ষ।
সব সময়েই পড়েন তিনি, সকাল থেকে সন্ধে,
ছুটির দিনে পড়েন তিনি, পড়েন পুজোর বন্ধে।
মাঝে মাজে প্রকাশ করেন গূঢ় জ্ঞানের তত্ত্ব
বিদ্যাখানা জাহির করেন বরেন্দ্রনাথ দত্ত—
হঠাৎ ঢুকে রান্না ঘরে বলেন ওসব কী রে?
ভাইঝি গীতা হেসে বলে, এসব কালো জিরে।
বরেনবাবু রেগে বলেন, জিরে তো হয় সাদা,
তিলও কালো জিরেও কালো? পেয়েছিস কি গাধা?
রান্না করার সময় কেবল পুড়িয়ে হাজার লঙ্কা,
হনুমতি হয়েছিস তুই, হচ্ছে আমার শঙ্কা।
হঠাৎ ছোট্ট খোকাটাকে কাঁদতে দেখে, দত্ত
খোলেন বিরাট বইয়ের পাতা নামটি 'মনস্তত্ত্ব'।
খুঁজতে খুঁজতে বরেনবাবু হয়ে গেলেন সারা—
বুঝলেন না, কেন খোকা মাথায় করছে পাড়া।
হঠাৎ এসে ভাইঝি গীতা দুধের বাটি নিয়ে,
খাইয়ে দিয়ে পাঁচমিনিটে দিল ঘুম পাড়িয়ে।
বরেনবাবু ভাবেন, খোকার কেমনতরো ধারা,
আধঘণ্টার চেঁচামেচি পাঁচমিনিটেই সারা?
বরেনবাবুর কাছে আরো বিরাট একটি ধাঁধা,
হল্‌দে চালের রঙ কেন হয় ভাত হলে পর সাদা?
পাথরবাটির গরম জিনিস ঠাণ্ডা হয় তা জানি,
পাহাড় দেশে গরম কেন এমন ছটফটানি!
পথ চলতে ভেবে এসব ভিজে ওঠেন ঘামে,
মানিকতলা যেতে চাপেন ধর্মতলার ট্রামে।
বরেনবাবু জানেন কিন্তু নানা রকম বিজ্ঞান,
জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন তিনি তাইতো এমন দিক্-জ্ঞান ॥

গোপন খবর

শোনো একটা গোপন খবর দিচ্ছি আমি তোমায়,
কলকাতাটা যখন খাবি খাচ্ছিল রোজ বোমায়,
সেই সময়ে একটা বোমা গড়ের মাঠের ধারে,
মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গিয়ে ছিল এক্কেবারে,
অনেক দিনের ঘটনা তাই ভুলে গেছ্‌ল লোকে,
মাটির ভেতর ছিল তাইতো দেখে নি কেউ চোখে,

অনেক বর্ষা কেটে গেল, গেল অনেক মাস,
যুদ্ধ থামায় ফেলল লোকে স্বস্তির নিশ্বাস,
হঠাৎ সেদিন একলা রাতে গড়ের মাঠের ধারে,
বেড়িয়ে ফেরার সময় হঠাৎ চমকে উঠি—আরে!
বৃষ্টি পেয়ে জন্মেছে এক লম্বা বোমার গাছ,
তারই মাথায় দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোর নাচ,
গাছের ডালে ঝুলছে কেবল বোমা-ই সারি সারি,
তাই-না দেখে ভড়কে গিয়ে ফিরে এলাম বাড়ি।
পরের দিনই সকালবেলা গেলাম সে ময়দানে,
হায় রে।—গাছটা চুরি গেছে...কোথায় কে তা জানে।
গাছটা ছিল। গড়ের মাঠে খুঁজতে আজো ঘুরি,
প্রমাণ আছে অনেক, কেবল গাছটা গেছে চুরি ॥

ভেজাল

ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস মিলবে নাকো চেষ্টায়।
ভেজাল তেল আর ভেজাল চাল, ভেজাল ঘি আর ময়দা,
'কৌন ছোড়ে গা ভেজাল ভেইয়া, ভেজালসে হয় ফয়দা!'
ভেজাল পোশাক, ভেজাল খাবার, ভেজাল লোকের ভাবনা,
ভেজালেরই রাজত্ব এ পাটনা থেকে পাবনা।
ভেজাল কথা—বাংলাতে ইংরেজি ভেজাল চলছে,
ভেজাল দেওয়া সত্যি কথা লোকেরা আজ বলছে।
'খাঁটি জিনিস' এই কথাটা রেখো না আর চিত্তে,
'ভেজাল' নামটা খাঁটি কেবল আর সকলই মিথ্যে।
কলিতে ভাই 'ভেজাল' সত্য ভেজাল ছাড়া গতি নেই,
ছড়াটাতেও ভেজাল দিলাম, ভেজাল দিলে ক্ষতি নেই ॥

এক যে ছিল

এক যে ছিল আপনভোলা কিশোর,
ইস্কুল তার ভালো লাগত না,
সহ্য হত না পড়াশোনার ঝামেলা
আমাদের চলতি লেখাপড়া সে শিখল না কোনোকালেই,
অথচ সে ছাড়িয়ে গেল সারাদেশের সবটুকু পাণ্ডিত্যকে।
কেমন ক'রে? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না ॥

বড়মানুষীর মধ্যে গরিবের মতো মানুষ,
তাই বড় হয়ে সে বড় মানুষ না হয়ে
মানুষ হিসেবে হল অনেক বড়।
কেমন ক'রে? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না ॥

গান-সাধার বাঁধা আইন সে মানে নি,
অথচ স্বর্গের বাগান থেকে সে চুরি ক'রে আনল
তোমার আমার গান।
কবি সে, ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল না ছোট বয়সে,
অথচ শিল্পী ব'লে সে-ই পেল শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সম্মান।
কেমন ক'রে? সে প্রশ্ন আমাকে করো না ॥

মানুষ হল না ব'লে যে ছিল তার দিদির আক্ষেপের বিষয়,
অনেক দিন, অনেক বিদ্রূপ যাকে করেছে আহত;
সে-ই একদিন চমক লাগিয়ে করল দিগ্বিজয়।
কেউ তাকে বলল, 'বিশ্বকবি', কেউ-বা 'কবিগুরু'
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারিদিক করল প্রণাম।
তাই পৃথিবী আজো অবাক হয়ে তাকিয়ে বলছে :
কেমন ক'রে? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না,
এ-প্রশ্নের জবাব তোমাদের মতো আমিও খুঁজি ॥

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র